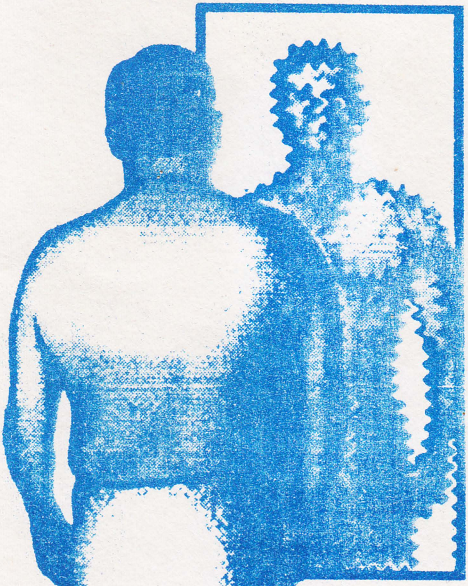
দর্পণে মুখোমুখি



শিবপ্রসাদ রায়

দর্পণে মুখোমুখি

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

কার্যালয়
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৪১৫

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

দর্পণে মুখোমুখি

আমাদের এই দেশে অর্থাৎ সংবিধানের ভাষায় "ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারতে" সবক্ষেত্রেই একটা ভণ্ডামি আত্মপ্রবঞ্চনা বা ভাবের ঘরে চুরি লক্ষ্য করা যায়। পূর্বসূরীদের দেখে দেখে উত্তরসূরীরাও সিদ্ধান্তে আসে, মিথ্যাচার এদেশে কোন অন্যায় কর্ম নয়। অনেক প্রবীণের ধারণা এখন যত দুর্নীতি মিথ্যাচার ভণ্ডামী আগে নাকি এতটা ছিল না। এটিও একটি সর্বৈব মিথ্যা কথা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই ভালো ল্যাংড়া আমের গাছ ছিলেন, আর আমরা সেই গাছেরই ফল হয়ে একালে একেবারে আমড়া হয়ে গেলাম এ কথা কোন যুক্তিতেই টেকে না। রামায়ণ মহাভারতকে যদি ইতিহাস ধরি সেখানেও এদেশের সাধারণ মানুষের নৈতিকতা কিম্বা অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উজ্জ্বল ছিল চোখে পড়ে না। সীতার মত সতীর বারবার অগ্নিপরীক্ষা চেয়েছে এই দেশেরই মানুষ। কুলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় সকলের সামনে নগ্ন করতে চেয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাই। দ্রোণাচার্য্যের মত একজন জেনারেলকে অভাবের তাড়নায় ছেলেকে দুধের বদলে চাল বেটে খাওয়াতে হয়েছে দুধের মত করে। দুর্নীতি এবং দারিদ্র্য আমাদের চিরদিনের সঙ্গী। কারণ, আমরা অলস এবং অকর্মণ্য। যুক্তি দিয়ে বিচার করে শক্তি দিয়ে নিজের ভাগ্য আমরা নিজে গড়ে নিতে জানি না। তাই, আমাদের আশ্রয় নিতে হয় কল্পনা, আবেগ, ভক্তির কাছে, মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার কাছে। দুর্বল, অলস, অকর্মণ্যদের এই একটিমাত্র নিরাপদ দুর্গ—কল্পনার দুর্গ। তাই এদেশে এত ধর্ম দেবতা ভক্তির ছড়াছড়ি। এই মিথ্যে আবেগ এবং ভক্তির ছড়াছড়ি আমাদের চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি করে দিল সত্যের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, বাস্তবতার সঙ্গে। আমাদের দেবতা, দর্শন, ধর্ম, মহাপুরুষদের বেছে নিয়ে বানিয়ে নিলাম ঠিক আমাদের মত করে। মহাদেবকে জ্ঞানের দেবতা মঙ্গলের দেবতারূপে কল্পনা করেছিলাম, বেশিদিন সেটা চালাতে পারলাম না। তাঁর হাতে গাঁজার কল্কে তুলে দিয়ে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষে করিয়ে ঠিক আমাদের লাইনে এনে ফেললাম। ভিখারী এবং গাঁজাখোর বানিয়ে দিলাম। অর্জুন সারাজীবন একটা মিথ্যে কথা

বলেনি, দাদাকে হাজারবার বারণ করেছে পাশা খেলতে, তাকে আমরা শুধু বীর বলে ছেড়ে দিলাম। আর যে ঘরের বৌকে বাজী রেখে জুয়ো খেলল তাকে বললাম—পণ্ডিত, স্থিরবুদ্ধি, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণের বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, শক্তি, কূটনীতি সারা বিশ্বে তুলনাহীন। তাঁর শৌর্য্য বীর্য্য, বীরত্বের জন্য তিনি আমাদের পূজ্য, নাড়ু খাওয়ার জন্য নয়। ননী, ক্ষীর, ছানা খাওয়া নাড়ুগোপাল এদেশে অনেক আছে। এদের আমরা ব্যঙ্গ করি, কটাক্ষ করি। তাঁর গীতা সর্বকালের গ্রহণযোগ্য। একটি চিরায়ত দর্শন, এগুলো আমাদের সহ্য হলো না। আমাদের বিকৃত কামনা বাসনা দিয়ে এক অদ্ভুত কৃষ্ণ বানিয়ে নিলাম। যে সারাদিন বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়, স্নানের ঘাটে মেয়েদের কাপড় লুকিয়ে রাখে, বয়সে বড়, বিয়ে হয়ে গেছে সম্পর্কে মামী, তার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করে। গীতা উদ্‌গাতা কৃষ্ণের চরিত্রে এগুলো প্রক্ষিপ্ত মিথ্যে বিকৃতি— একথা আমাদের মনে হয় না। মনে হয় না মুসলিম আমলে অনুগ্রহভাজন পণ্ডিতদের দিয়ে এগুলো লেখানো। ইসলাম প্রবক্তার চরিত্রের মতো করে কৃষ্ণকে দেখানোর অপচেষ্টা। বরং এসবে বিশ্বাস করে আমাদের সব নোংরা ইচ্ছাগুলো, বিকৃতিগুলো কৃষ্ণের ওপর চাপিয়ে দিলাম। আমাদের কাজের সুবিধের জন্য এই ইচ্ছা-বিকৃতিগুলো যুক্তিহীন ভক্তিবাদে ভিজিয়ে রাধাতত্ত্বের উপস্থাপন করলাম। যে তত্ত্ব তত্ত্বই রয়ে গেল। সত্য কখনো দেখা গেল না। শুধু রয়ে গেল বিচিত্র ব্যাখ্যায়। যৌন বিজ্ঞানীরা সকলেই বলেন বীর্য্যহীন এবং ভীতু লোকেদের এই ধরণের কুরুচিকর আলোচনায় একধরনের তৃপ্তি হয়।

গীতায় সত্য আছে, কৃষ্ণের জীবনে সত্য আাছে, যে সত্য মানুষকে তেজস্বী করে, সাহসী করে, মৃত্যুভীতি জয় করে, নির্বিকার নিরাসক্ত করে। এগুলো আমাদের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। তার চেয়ে কান্তাপ্রেম, রাধাপ্রেম, একঅঙ্গে রাধাকৃষ্ণ—এসবের আলোচনা, ব্যাখ্যা আমাদের চরিত্র উপযোগী। ভক্তি দেখানোও হয়, ঠিক জায়গায় সুরসুরিটাও দেওয়া হয়। কেউ ধরতেও পারে না। নোংরা অপকর্মের ওপর একটা ধর্মের সাদা চাদর বিছানো রইল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই ভণ্ডামী আত্মপ্রবঞ্চনা চলছে। আমরা কান্তাপ্রেম

রাধাপ্রেম, আর পঞ্চমীতে কেন বেগুন খেতে নেই, ত্রয়োদশীতে লাউ কেন অভক্ষ্য তার চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি; আর কয়েক হাজার সাহসী কিন্তু আমাদের চেয়ে নিম্নমানের মানুষ সারাদেশটা দখল করে সব তছনছ করেছে। মা, বোন, মন্দির, দেবতা কারো মর্য্যাদা আমরা রক্ষা করতে পারিনি। দুর্বল, স্বার্থপর, কল্পনাশ্রয়ী, মিথ্যুক একটা জাতির জীবনে এগুলোই ঘটে। অন্তঃসারশূন্য ভণ্ড জাত কখনো তার নিজস্বতা নিয়ে, মর্য্যাদা নিয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না, হারিয়ে যায়। এটা জগতের নিয়ম। মাৎস্যন্যায় বলেছে ঃ বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবে। অর্থাৎ শক্তিশালী সংগঠিত জাত অসংগঠিত দুর্বল জাতকে আত্মসাৎ করে নেবে। শক্তিমানদের জন্যে প্রবাদ রয়েছে ঃ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্বলদের জন্য জগৎ তদ্বির ভোগ্যা। আমরা সোজাসুজি মোকাবিলা এড়াতে চাই। তদ্বির করে সব ব্যবস্থা করে নিতে চাই।

এগুলোই জীবন থেকে, বাস্তব থেকে, সংগ্রাম থেকে সরে আসা। ধীরে ধীরে অন্তরালে যাওয়া, হেরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া। আত্মপ্রবঞ্চক জাতি এই হারানোর নিষ্ঠুর সত্যটাকে স্বীকার করতে চায় না। চাপা দিতে চায় আরো বড় মিথ্যে দিয়ে। এদেশের ইতিহাসে পড়ানো হয় সাতশো বছর মুসলমান আর দুশো বছর ইংরেজ ভারতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু কথাবার্তায় কাগজপত্রে আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনটাকেই স্বাধীনতা আন্দোলন বললাম। মুসলমান আমলটা স্বাধীনই ছিলাম ধরে নিলাম। ইংরেজ যদি তার শাসন সাতশো বছর কায়েম রাখতে পারত তাহলে আমরা কি বলতাম কে জানে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে লড়ে ইংরেজ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিল এশিয়ায় তারা সাম্রাজ্য রাখবে না। তাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। আমরা মিথ্যের পাহাড় রচনা করতে লাগলাম। মহাত্মা গান্ধীর রামধুন গানে আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে গেল ইংরেজ, এটা গান্ধীভক্তদের ধারণা। ইংরেজ পরিত্যক্ত অসহায় সৈনিকদের গায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের তক্‌মা লাগিয়ে ভারতের এক কোণে ইম্ফলে যে লড়াই হয় তাতেই ভারত ছাড়লো ব্রিটিশ, নেতাজী অনুরাগীদের বিশ্বাস। আর যারা বিপ্লববাদের সমর্থক, তাদের ধারণা দুটো মরচে ধরা মসার পিস্তলের আওয়াজেই ইংরেজ পালিয়ে গেল। মহাত্মা

গান্ধী অচলায়তন ভারতের একটি বড় অংশকে খালি হাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছিলেন ঠিক কথা, নেতাজীর দেশপ্রেম, বীরত্বের কোন তুলনা নেই একথাও সত্য, বিপ্লবীরাও যুবসমাজে একটা প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন এতেও দ্বিমত নেই। কিন্তু এইসবের সামগ্রিক যোগফলে কতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ইংরেজের মধ্যে? তিলমাত্র। প্রতিক্রিয়া কিছু হয়ে থাকলে, আতঙ্ক কিছু হয়ে থাকলে তা হয়েছে নৌবিদ্রোহের কারণে। নৌবিদ্রোহই ব্রিটিশের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। একথাটা আমরা কেউ বলি না। মূল কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভারতে না হয় এইসব বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছিল। ব্রিটিশ কিন্তু ছেড়ে দিয়ে গেল শুধু ভারত নয়, সিংহল, বার্মা, মালয় সব। আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্য আজও রয়েছে। স্বাধীনতাটা শুধু আমাদের ইচ্ছায় হলে আমরা ভারতবর্ষকে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত হতে দিতাম না। ইংরেজ এশিয়ায় সাম্রাজ্য রাখবে না তাই চলে গেল। তারা ঠিক করলো ভারতকে দুটুকরো করে দিয়ে যাবে, দিয়ে গেল। ঝড়ে পাখী মরাটা আমরা ফকিরের কেরামতি বলে চালিয়ে দিলাম। মিথ্যা দিয়ে, প্রবঞ্চনা দিয়ে আমাদের কৃতিত্ব শতগুণ করে দেখালাম, কারণ, সত্যের সামনে আসা, দর্পণের মুখোমুখি হওয়ার আমাদের সাহস নেই, স্বভাবও নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং কর্মকাণ্ডকে আমি ছোট বলে দেখাতে চাইছি না। অহেতুক বড় না করে নির্জলা সত্যটুকু দেখাতে চাইছি। এই সত্য আরও প্রকট হয় দেশে হাজার হাজার ভাতা পাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী দেখে। যেন তেন প্রকারে পেনশন পাবার অপচেষ্টা। পেনশন হারানোর ভয়। সরকারী কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে দ্বিধা, সঙ্কোচ। এইসবে বোঝা যায় এঁরা কি ধরণের সাহসী ত্যাগব্রতী বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বাংলা, অখণ্ড বাংলা। শতশত বিপ্লবী দেশের জন্য ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে একথা বেশ গর্বের সঙ্গে আমরা গল্প করে থাকি। সত্যি কথাটা শুনলে লজ্জা হবে, উনিশশো আট থেকে উনিশশো তেতাল্লিশ এই পঁয়ত্রিশ বছরের বিপ্লব আন্দোলনে পুর্ব বাংলা, পশ্চিমবাংলা মিলিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দানের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ। পরিসংখ্যান না দেখেই বলা যেতে পারে এই পঁয়ত্রিশ বছরে কালাজ্বর, পালাজ্বর,

ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়াতে প্রাণ দিয়েছে পঁয়ত্রিশ লক্ষের অধিক মানুষ।

ট্র্যাজেডি আরো আছে ঃ এই অখণ্ড বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী, যে অধিকারে তারা বাংলার দুই তৃতীয়াংশ পাকিস্তান করে নিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই প্রদেশে কিন্তু একজন মুসলমানও ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দেয়নি। এই যে চল্লিশ জন এরা সবাই ছিল হিন্দু। সারা ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের চিত্র এক। দেশের জন্য ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদানের তালিকায় নেই কোন মুসলমানের নাম, এই নিদারুণ সত্যটা আমাদের চমকে দেয় না, প্রশ্ন জাগায় না। কারণ, সত্য আমাদের অস্বস্তি দেয়। সারা ভারতে একমাত্র ব্যতিক্রম আসফাকউল্লা। মুসলমান হিসাবে ইনিই উত্তরপ্রদেশে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু বিরল ব্যতিক্রমটা সরল নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা করে। আমরা কিন্তু মিথ্যাটাই বারবার উচ্চারণ করেছি। হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লব করার মিথ্যে গল্প আজও করে চলেছি। প্রশ্ন তুলিনি, তুললে সত্যের মুখোমুখি হতে হয়, বড় অস্বস্তি তাতে। গোঁড়া মোল্লাদের হাত থেকে তুরস্ককে বার করে এনে এক উন্নত আধুনিক রাষ্ট্ররূপে তৈরী করতে চেয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক। নজরুল যাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন “কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই”। খলিফাপন্থীরা আন্দোলন শুরু করলো কামালের বিরুদ্ধে। এই প্রগতি বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করতে বললেন মহাত্মা গান্ধী। আশা এই আন্দোলন সমর্থন করলে যদি মুসলমান সমাজ দয়া করে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে। এই একটি ঘটনাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভুমিকাটি আরো স্পষ্ট করে দেয়। এগুলো ইতিহাসের সত্য। আমরা মিথ্যের জগতে থাকতে ভালোবাসি। তাই এইসব সত্যকে উপেক্ষা করি।

অনেকে ক্রুদ্ধতায় মহাত্মা গান্ধীকে দুরাত্মা বলেন। মুসলিম তোষণের নায়ক এবং পাকিস্তানের স্রষ্টা বলে অভিযুক্ত করেন। আমি করি না। কারণ, আমার ধারণা মানুষের কিংবা জাতির জীবনে দু'ধরণের প্রেরণা আসে। কেউ বলে টিফিনে তুই কোথাও যাসনে দুজনে অঙ্ক করবো। কেউ বলে এই চল জঙ্গলে গিয়ে বিড়ি খেয়ে আসি। ছাত্রটি তার প্রবণতা অনুযায়ী বন্ধু চয়ন করে। আমাদের

জাতীয় জীবনেও দু'ধরণের নেতৃত্ব এসেছিল। শিথিল নড়বড়ে আত্মসমর্পণে উন্মুখ মুসলিম তোষণে অভ্যস্ত মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে বলিষ্ঠ বাস্তববাদী ত্যাগদীপ্ত সাভারকার। আমরা ভণ্ডামি ভালবাসি, তাই মহাত্মা গান্ধীকে বেছে নিলাম, অহিংসা বেছে নিলাম।

অনেকেই মনে করেন অহিংসার মধ্যে দিয়ে বিনা রক্তপাতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। মিথ্যে বলেই এগুলো বিশ্বাস করি। লিওনার্ড মোশলে তার "লাস্ট ডেজ অফ ব্রিটিশ রাজ" বইয়ে লিখেছেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মুসলমানদের হাতে শুধু পাঞ্জাবেই মারা গেছে ছ'লক্ষ হিন্দু। একটা মহাযুদ্ধেই শুধু এত মানুষ মারা যায়। এর সঙ্গে আছে নোয়াখালির "নরমেধ যজ্ঞ" এবং সুরাবর্দীর পরিচালনায় "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং"।

এত নরমেধের পরও গান্ধীপন্থীরা অহিংসার জয় দেখেন। পাঞ্জাবে ছ'লক্ষ হিন্দু নিহত হয়েছিল তার মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ শিখ হিন্দু, দেড়লক্ষ অশিখ হিন্দু। এটা কঠিন সত্য, তাই শিখেরা একথা ভুলে গেল। হত্যাকারীদের হাতে হাত রেখে তারা হিন্দু হত্যা করছে, খালিস্থান চাইছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলছে। মহাত্মা গান্ধী পাঞ্জাব এবং কলকাতার ঘটনায় কোন প্রতিবাদ করেননি। নোয়াখালিতে শান্তিসভায় সুরাবর্দীকে সম্বোধিত করলেন "শহীদ সুরাবর্দী সাহেব" বলে। এঁকেই আমরা মহাত্মা বললাম। লক্ষ লক্ষ বছরের একটা প্রাচীন জাতির পিতা বলে চিহ্নিত করলাম। আর বীর সাভারকার যিনি জীবনে কখনো আপোষ করেননি অন্যায়ের সঙ্গে, যিনি অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা ছিলেন, যিনি গোটা জাতিকে মিলিট্যান্ট করতে চেয়েছিলেন। যাঁর প্রেরণায় সুভাষ বিদেশে গিয়ে সেনা সংগঠিত করে নেতাজী হলেন। অকথ্য অত্যাচার, যন্ত্রণা আর জেল ছিল যাঁর জীবনের সারা অংশ জুড়ে। সেই ত্যাগব্রতী সৈনিক ব্যারিষ্টার বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে আমরা ভালো করে চিনিই না। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল ম্যনেক্‌শ তাঁকে চিনতেন। তাই তিনি লিখেছেন ঃ সাভারকার নিজের জন্য কিছু চাননি। ভারত স্বাধীন হোক এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভে তিনি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন তার চাইতেও বেশী আঘাত

পেয়েছিলেন ভারত বিভাগে। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের পশ্চাৎ অপসারণ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে ভারত পাকিস্তান লড়াইয়ে ভারতের জয় তাঁর মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করতো। তিনি নিশ্চয়ই ডেকে আমাকে প্রশ্ন করতেন তোমার হাতে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, সারা ভারতের জনমত তোমার পিছনে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে ভাঙতে তোমার তেরোদিন সময় লাগলো কেন? আর মাত্র ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরলে কেন? আমি তাঁকে উত্তর দিতাম, এ দোষ আমার একার নয়। যদি আপনি আমার মাথার ওপর থাকতেন তাহলে আমি মাত্র পাঁচদিনে শত্রুকে পরাজিত করতাম আর তিনলাখ শত্রুসেনাকে বন্দী করে নিয়ে আসতাম।। ১৯৭১ সালে ভারতীয় বাহিনীর বিজয় সংবাদ পেলে বীর সাভারকার নিশ্চয়ই আমাকে ডাকিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করতেন। সেটাই হতো আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান। সেই সম্মান পেলে আমি কৃতজ্ঞ হতাম। ম্যনেক্শ বললে কি হবে, আমরা মিথ্যে ভালবাসি, ভণ্ডামি ভালবাসি। তাই সত্যনিষ্ঠ সাভারকার আমাদের কাছে অজ্ঞাত পরিচয়ের অন্ধকারেই রয়ে গেলেন। কারণ, সত্য বড়ই অপ্রীতিকর।

গ্রামোফোন রেকর্ডে—বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু মুসলমানের গুল্‌বাগ এই বাংলা—শুনেই আমরা গদগদ হয়ে গেলাম। সিরাজদ্দৌলার মতো একটা ডিবচ্‌কে ন্যাশনাল হিরো বানিয়ে দিলাম। সিরাজের হাতে কারো মা বোন নিরাপদ ছিল না। সিরাজ জগৎ শেঠের বিধবা বোন, অসামান্য সুন্দরী রাণী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরীর দিকেও হাত বাড়িয়েছিল। মেয়েছেলের ব্যাপারে তার শত্রুমিত্র ভেদ ছিল না। তাই তার পতন ঘটানো হলো। আমরা সিরাজকে বীর, আর জগৎশেঠকে বলি বিশ্বাসঘাতক। তার কারণ আমরা নাটক ভালবাসি, মিথ্যা ভালবাসি। টিপু সুলতান নাকি এক বীর, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যোদ্ধা। নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তাই নিয়ে কত নাটক, যাত্রা, থিয়েটার। অথচ তার যে রাজ্য সে রাজ্যের রাজা ছিল এক হিন্দু। টিপু সুলতানের বাবা

হায়দার আলি ছিল তার কর্মচারী। সেই রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। তার মানে টিপু, টিপুর বাবা হচ্ছে খুনী এবং বিশ্বাসঘাতক। একথা কিন্তু কেউ বলে না, এটা নিষ্ঠুর সত্য কিনা তাই।

সাভারকার বলেছিলেন রাজনীতিকে হিন্দুঘেঁষা করো। এই কথায় নিষ্ঠুর সত্য আছে তাই আমাদের কাছে সহ্য হ'ল না। মহাত্মা গান্ধী বললেন, যে কোন মূল্যে হিন্দুমুসলিম ঐক্য চাই। আমরা এই মিথ্যের পিছনে দৌড়ে অর্ধেক ভারত হারালাম। রমেশ মজুমদার তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, হিন্দুমুসলিম ঐক্য ভারতে কোনদিন ছিল না। এই মিথ্যেটাকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না, ব্যর্থ হওয়ার পরও প্রচেষ্টার ক্ষান্তি নেই। সারা ভারতে হিন্দু সমাজের ঐক্যের কথা বললে এই ব্যক্তিরাই বলে হিন্দু ঐক্য অসম্ভব। কিন্তু হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্ভব। এই অবাস্তব কল্পনা কোন্ মনের ফসল? নিঃসন্দেহে ভণ্ড এবং স্ববিরোধী মনের। আজ একথা ফলিত রসায়নের মতই প্রতিষ্ঠিত, এই ভারতে হিন্দুত্বচ্যুত ব্যক্তিরাই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান নির্মাণ করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টভূমি গঠনে তারাই অগ্রণী। হিন্দুত্বচ্যুত শিখেরা খালিস্থানের দাবী করছে। হিন্দু লাইন থেকে ডিরেল্ড হলেই এই দেশের অখণ্ডতার প্রতি আর কোন মমত্ববোধ থাকছে না। এই সত্যটা আমাদের চোখে পড়ছে না। কারণ, দীর্ঘকাল থেকে আমাদের চোখে লাগানো আছে মিথ্যের কাজল। তাই এদেশের জাতীয় স্তরের নেতারা পাকিস্তান হতে পারে কল্পনাতেও ভাবেননি। পাকিস্তান হবার পরেও তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকবে। মিথ্যের নেশা বোধহয় গাঁজা চরসের অপেক্ষাও শক্তিশালী। দেশটা যখন মুসলমানরা ভাগ করেই নিলো, তখন লোক বিনিময় করে হিন্দু মুসলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে নেওয়া হ'ল না কেন? তাতে যে ভণ্ডামি নেই, সত্য আছে। তা আমাদের ভাল লাগবে কেন? টু নেশন থিয়োরীর ভিত্তিতে দেশটাকে ভাগ করতে পারলাম। ওটা পাকিস্তান এবং মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষিত হয়ে গেল, আমরা কিন্তু সাহস

করে বলতে পারলাম না এটা হিন্দুর দেশ। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই দুটো রাষ্ট্রই আমাদের জন্মশত্রু। জন্মকাল থেকেই এরা আমাদের ক্ষতি করে আসছে এবং যতদিন বেঁচে থাকবে করবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম—যার বীজে বিদ্বেষ থাকে তার ফসলে বিদ্বেষ থাকবেই। পাকিস্তান আমাদের বারবার আক্রমণ করেছে, জিততে পারেনি, হেরে গেছে। জিতলে কি করতো তাও জানি, ইতিহাস সাক্ষী। অথচ অসংখ্য অপরাধের নায়ক এক লক্ষের কাছাকাছি পাকিস্তানী সৈনিকদের বন্দী করে এনে তিনবছর মাইনে দিয়ে পুষে আমার তাদের ফেরৎ দিয়েছি। ওরা আমাদের সাড়ে চারহাজার নিরপরাধ সৈনিককে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। ওরা দেশে আইন পাশ করে হিন্দুর সম্পত্তি মানে শত্রুর সম্পত্তি। অর্থাৎ হিন্দু মানেই শত্রু। এটা তাদের ধর্মের ঘোষণা।

সারা পৃথিবীর কোন মুসলমান এটা গর্হিত কাজ বলে মনে করেনি। ওদের চক্ষুলজ্জা নেই। আমরা মিথ্যে ভালবাসি তাই চক্ষুলজ্জা আমাদের। অনুপ্রবেশ, সব দেশে চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতা—শাস্তি মৃত্যু। আমরা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বলতে পারি না, ভোটের লোভে তাদের রেশন কার্ড করে দিই। আমাদের সীমান্তে আমরা বেড়া দিলে ওরা গুলি চালায়, আমরা চুপ করে থাকি। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রতিটি ভারতীয় অঞ্চলে আতঙ্কিত জীবন কাটায় হিন্দুরা। বাংলাদেশী ডাকাতেরা এসে প্রায়ই ডাকাতি করে। কিছু না পেলে গরু ছাগলগুলোকেই নিয়ে যায়। এদেশের সরকার কিছুই করে না। যে কোন সময় আমরা বাংলাদেশকে চূর্ণ করে দিতে পারি, দখল করে নিতে পারি, এই আন্দাজ যদি ওদের দিতে পারতাম, তাহলে সব বন্ধ হয়ে যেত। এগুলো সরল সত্য তাই মনে মনে ভাবলেও বলতে পারি না, শত্রুকে মিত্র বলে ভণ্ডামি করি। ধ্বংসকে নিকটতর করি।

স্বামীজী বলে গেলেন, একজন ব্যক্তি হিন্দুসমাজ থেকে অন্য ধর্মে চলে গেলে হিন্দুর শুধু একটা সংখ্যাই কমে না, একজন শত্রু বাড়ে। তাহলে হিন্দুর প্রতি অন্যধর্মের কি ভূমিকা দাঁড়াচ্ছে? শত্রুর ভূমিকা। তারা তা গোপনও করে না। বিবেকানন্দ সত্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের যে সত্য

হজম হয় না। তাই মিথ্যের শামুকে আমরা ঢুকে গেলাম। বাংলাদেশ, পাকিস্তানকে মিত্র মনে করছি। অন্যধর্মের লোকেদের বন্ধু ভাবছি। ভাবতে আপত্তি নেই। কিন্তু তারা আমাদের কি ভাবছে সেটা আমরা ভাবতে পারবো না কেন? পারবো না, কারণ, আমরা ভাবের ঘরে চুরি করতে অভ্যস্ত বলে। এক একটা দেশে যেমন এক এক ধরণের ভাষার চলন, তেমনি এক একটা দেশের বন্ধুত্ব অর্জনেও বিচিত্র ব্যবহার প্রয়োজন হয়। পাকিস্তান বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। সারা দেশে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েও তারা আজ বাংলাদেশের বন্ধু। আর আমরা? কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, বারো হাজার তাজা সৈনিকের প্রাণ দিয়ে বাংলাদেশের দশ কোটি মুসলমানকে বাঁচিয়ে দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে আমরা হলাম শত্রু। আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যেই জটিলতা রয়েছে। কারণ, আমাদের চিন্তার উৎস ভূমিটাই মিথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শুধু হিন্দু-মুসলমান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা রাজনীতির ক্ষেত্রেই এই মিথ্যাচার সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সবক্ষেত্রে মিথ্যা কল্পনা অবাস্তবতাই এখন আমাদের একমাত্র নিয়ামক। ছান্দোগ্য উপনিষদে অশ্বিনীকুমার নারদকে উপদেশ দিচ্ছেন, দ্যাখো নারদ, যা কিছু ভালো, সুন্দর, উদার, পবিত্র সব নির্ভরশীল শক্তিতেই। শক্তি ছাড়া কোন ভালো কথা বলা ভণ্ডামি মাত্র। যেহেতু হিন্দুসমাজ সংগঠিত নয়, শক্তিশালী নয়, তাই অধিকাংশ ব্যক্তিই দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন—সুতরাং ভণ্ডামি, মিথ্যাচার তো আমাদের আশ্রয় হবেই। আগে মুনিঋষিরা সাধনা করতেন, তপস্যা করতেন, কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। উদ্দেশ্য শক্তিসংগ্রহ। সেই শক্তি দিয়ে সমাজকে শুদ্ধ করতেন। রাজা মহারাজারা যাদের ভয় করতেন, ভক্তি করতেন। বশিষ্ঠ, চাণক্য, রামদাসের মতো গুরুদের জন্যই আমরা রামচন্দ্র, চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজীর মতো আদর্শ রাজা পেয়েছি। আগের সাধুদের চেহারা রুক্ষ, কৃশকায়, তেজোময়। এখন অধিকাংশ সাধুসন্ন্যাসীদের দেখলে মনে হয় যেন অনেকদিন ধরে শাসক দলের M. L. A. কিম্বা M. P.। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে প্রোটিন। তেল গড়িয়ে পড়ছে, পড়বেই। কারণ সাধুগুরুদের জীবন রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও

নিশ্চিন্ত। রাজনৈতিক নেতাদের জনগণের জন্য কিছু না কিছু করতে হয়। নির্বাচনের সময় কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সাধুগুরুদের সেসব বালাই নেই, নিরুদ্বেগ্ন জীবন। এদের অধিকাংশই আসন, প্রাণায়াম কিছুই করেন না। খাওয়া দাওয়া ভালোই হয়। ফলে প্রেসার, সুগার, ডায়াবেটিস, বাত, অনিদ্রা সব আছে। অধিকাংশই রোগী, রোগ সারলে বড়ো জোর ভোগী হবেন. যোগী কখনই নয়। নিরাপদ আশ্রম নিশ্চিন্ত ভোগ হারানোর ঝুঁকি নেবার সাহস এদের নেই। ভেজালদার ব্যবসায়ী, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের এঁরা শিষ্য করতে পারেন, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাদের দয়াতেই এঁদের জীবন চলে। এই পরান্নভোজী, ভীরু, অলস, মিথ্যাবাদী, অসহায় জীবগুলোকে আমরা সাধু, গুরু বলি। কারণ, আমরাও মিথ্যা ভালবাসি, প্রবঞ্চনা ভালবাসি, ভণ্ডামি ভালবাসি। এঁদের খাদ্য, বস্ত্র সব জোগায় সমাজ। কিন্তু এইসব সাধুরা সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র সম্পর্কে নির্বিকার থাকেন। দেশের বিপদে একটি কথা বলেন না, অথচ কথাবার্তায় এঁরা আভাস দেন জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সব এঁদের নখদর্পণে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে আশ্রমটা ঠিকমত চলে না, সাধুতে সাধুতে মুখ দেখাদেখি নেই, গুরুভাই গুরুভাইয়ে ঝগড়া। যে পাড়ায় আশ্রম সেই পাড়ার লোকে এদের সহ্য করতে পারে না। ভক্তরা সব আসে দূর থেকে। ভুয়ো রেশন কার্ডের মালিকেরা যেমন দূরের রেশন শপ থেকে মাল নেয়। চক্ষুলজ্জার সংকোচ এবং ধরা পড়ার ভয় থাকে না। গুরু, শিষ্য, ভক্ত আমরা সবাই এক অস্য জীবন কৃত্রিম বোঝার মত টেনে নিয়ে চলেছি। শক্তি না থাকলে, সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ধর্মকে সমাজ নিরপেক্ষ, পরিস্থিতি নিরপেক্ষ-এই কল্পনার বস্তু বানিয়ে ফেললে এইরকম অপমানের জীবন, গোঁজামিলের জীবনই বেছে নিতে হয়।

কৃষ্ণ গীতায় স্পষ্ট করে বলেছেন, যে নিজের জন্য রান্না করে সে পাপ ভক্ষণ করে। মানে সমাজকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ বাস্তবতা। সে কথায় আমরা কর্ণপাত করলাম না। তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের ছবি এঁকে দিলেন অর্জুনের সামনে। বললেন, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় চাই। শুধু একটার ওপর জোর দিলে অসম্পূর্ণ মানুষ, বিক্ষুব্ধ জীবন। গীতায় মূল বক্তব্য এটাই। আমরা মিথ্যে ভালবাসি,

তাই শুধু ভক্তিকে আঁকড়ে ধরলাম। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা কি দেখছি? কাউকে ভক্তি করতে গেলে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তাকে ভক্তি করা যায় কিনা, হিসেব ধরেই ভক্তি করি। অর্থাৎ জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও পথের জ্ঞান চাই। হেঁটে বা গাড়ীতে যাতেই যাই পরিশ্রম, অর্থাৎ কর্ম। তবে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হ'ল। এখন আমাদের ভক্তির মাত্রা এত বেশী যে ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা কৃষ্ণের ভুলভ্রান্তিগুলোও সংশোধন করে নিচ্ছি। তিনি বলে গেলেন, নিজের ধর্মে মরে যাবে, অন্য ধর্ম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আমরা তাঁর ভ্রম সংশোধন করে নিয়েছি। সব ধর্মকে সমানভাবে গ্রহণ করতে চাইছি। মৃত্যু নিকটতর হচ্ছে। মিথ্যায় নিমজ্জিত হচ্ছি। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, আমি অন্য কোথাও নেই, আমি তোমাদের সবার মধ্যে আছি। এতে নিজের দিকে তাকাতে হয়, নিত্য আত্মসমীক্ষায় নিজেকে সংশোধন করতে হয়। এ কথাগুলো আমাদের ভাল লাগলো না। তেত্রিশ কোটী দেবতা, অপদেবতা, হাজার হাজার গ্রহ, উপগ্রহ, গোমেদ, পলা, অনন্তমূল, ঘোড়ার খুরের পিছনে আমরা ছুটছি। কৃষ্ণের বক্তব্যে বাস্তবতা আছে, আমরা চাই—কল্পনা। তাই কৃষ্ণের চেয়ে গৌরাঙ্গ আমাদের কাছে বড় হয়ে গেল। যুক্তির চেয়ে শক্তির চেয়ে বড় হয়ে গেল ভক্তি। ভগবৎ সাধনায় চিরকাল অর্জিত হয়েছে—শক্তি, তেজ, সাহস, পবিত্রতা। ভক্তির সাধনায় আমরা অর্জন করলাম ভণ্ডামি, পৌরুষহীনতা। আর কারণে অকারণে কাঁদবার ক্ষমতা। লক্ষ লক্ষ লোক এটাকেই ভক্তি মনে করে। জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনাকে অসাড় করে দিয়ে যেমন নেশাখোরেরা দুঃখ ভুলে একধরণের আনন্দ অনুভব করে থাকেন। এই ধরণের যুক্তিহীন, জ্ঞানহীন ভক্তিতে একটা মাদকতার সৃষ্টি হয়। ভারসাম্য হারিয়ে, অসংলগ্ন হয়ে লোকটা ভাবে ভগবৎ সান্নিধ্য হচ্ছে। নইলে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের পরেও এইসব ব্যক্তিদের চরিত্রে এত অসঙ্গতি থাকে কেন? মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা, চৈতন্যহীনতা কেন? পূর্ববঙ্গের বন্ধুরা কত উৎসাহের সঙ্গে গল্প করেন, আমাদের ওখানে যা কীর্তন হতো না, এই পশ্চিমবঙ্গে আর কী হয়? আমাদের গ্রামেই তিনদিনে পঁচাশী মন চালডালের খিচুড়ি রান্না হতো। বৈষ্ণবেরা গলায় মালা, নাকে রসকলি আর কপালে ফোঁটা নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে

জড়িয়ে ধরে ভীষণ কাঁদত, সে কান্না যদি আপনারা দেখতেন! উৎসাহী শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করে, তারপর মুসলমানেরা যখন পেটাতে শুরু করল তখন কি করলেন? উত্তর, তখনও কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলাম। কোন্‌টা কিসের জন্য কেঁদেছিলাম মনে আছে? না মনে নেই। এই আমাদের ধর্ম, এই আমাদের ভক্তি। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভণ্ডামি। যাদের আমরা হিজড়ে বলি, তাদের কোন অসম্মানজনক কথা বলে দেখুন। আর কিছু না পারলে দু'হাতে তালি দিয়ে গালাগালি দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিয়ে যাবে। তাদেরও আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। আমাদের দেশের ধর্মাচরণকারীরা সব ভুলে গেছে। মনে আছে কান্নার কথা আর খিচুড়ির কথা। কখন কিসের জন্য কেঁদেছে সে কথাও মনে নেই। তেত্রিশ কোটি দেবতা আর এই চেতনাহীন কীর্তন দিয়ে আমরা জড়ের উপাসনা করে চলেছি। দেশ হারানোর, মনুষ্যত্ব হারানোর, মা-বোনেদের সম্ভ্রম হারানোর মত ঘটনাগুলোও আর আমাদের বিচলিত করতে পারছে না।

সত্যিই আমাদের ভক্তি যে ভক্তি নয়, কাপট্য ভণ্ডামি, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে সর্বত্র। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করা হয়েছে। বিগ্রহকে চূর্ণ করা হয়েছে, নানাভাবে অপবিত্র করা হয়েছে। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরায় কৃষ্ণের জন্মস্থান, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের মন্দির এর মধ্যে অন্যতম। এইসব তীর্থ দর্শন করতে যান কোটি কোটি ভক্ত, লক্ষ লক্ষ সাধু, সন্ন্যাসী, গুরু। এদের কারো মনে কখনো ইচ্ছে জাগে না, আমাদের দেবতাকে আবার পূর্ণ মর্য্যাদার সঙ্গে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করি। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির চূর্ণ করে মসজিদ তো করেছেই, শিবলিঙ্গটিকেও পাশের কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শতশত বছর ধরে শিব সেই কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে—দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। ভাবখানা এইরকম, আহা বেচারী শিব ওখানে আছে ওখানেই থাকুক—বেঁচেবর্তে থেকে আমাদের কল্যাণ করে, তাই এই প্রণামী। অবহেলিত, অপমানিত শিবকে উদ্ধার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা কোন ভক্তের হয় না। কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় ঠিক একই দৃশ্য। কারাগার ভেঙ্গে মসজিদ

তৈরী করেছে। কোটি কোটি কৃষ্ণভক্ত রয়েছেন দেশে। মালায়, টিকিতে, রসকলিতে, নামাবলীতে সারা শরীরে কৃষ্ণভক্তির সাইনবোর্ড টাঙানো। কিন্তু এঁদের কখনো মনে হয় না—কৃষ্ণ অপমানিত, তাঁর পবিত্র জন্মস্থান বিধর্মী কবলিত, জীবন দিয়েও কৃষ্ণ জন্মক্ষেত্র উদ্ধার করা দরকার। রামচন্দ্রের জন্মভূমিও তাই, মসজিদ। ভক্তদের কথা ছেড়েই দিলাম, শিবভক্ত, কৃষ্ণভক্ত, রামভক্ত গুরুদেবও এ ব্যাপারে কোন হুঁস নেই। এই ভক্ত এবং গুরুরা ভণ্ড কপট না হলে দেখা যেত, এরা লাখে লাখে এইসব তীর্থে গিয়ে কীর্তন করছে প্রতিজ্ঞা করছে-হয় ইষ্টদেবের প্রতিষ্ঠা, নয় এখানেই কীর্তন করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেব। নেই। নপুংসকের ব্রহ্মচর্য্য, ভিখারীর বৈরাগ্যের মতই আমাদের ভক্তি, শুধুই আত্মপ্রবঞ্চনা। মিথ্যাবাদী আর আত্মপ্রবঞ্চকেরা বাস্তবের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। মনের গভীরেও যে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির একান্ত অভাব সেটাও প্রকাশিত হয়ে যায় আমাদের ভাষায়, মাঝে মাঝে, যখন অবচেতন থাকি। অনেক ধার্মিক ব্যক্তিকে বেশ হাসতে হাসতেই অতিথিদের বলতে শোনা যায় আপনারা একটু বসুন, আমি একবার মন্দির থেকে ঘুরে আসি, অর্থাৎ পায়খানা থেকে। বহু ভক্তিমতী গৃহস্বামিনী বলেন, আপনারা বসুন উনি একটু ঠাকুরঘরে গেছেন। মানে ল্যাট্রিনে। অরক্ষিত মনের মধ্যে আমাদের ঠাকুরঘর, মন্দির, পায়খানা এক। যখন সতর্ক সচেতন তখন কপট ভক্তির পরাকাষ্ঠা। দেবমন্দির মনোমন্দির হৃদয়মন্দির সবই তো তিনি। তখন ভক্তিরসের কি আঠা। সব রস শুধু আমাদের কল্পনায়। যেখানে অলৌকিকতা অতীন্দ্রীয়তা স্বপ্ন কল্পনা, মানে মিথ্যা, আমাদের মন ছুটে যায় সেখানেই। রামকৃষ্ণ বললেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে, মন মুখ একে করতে, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে। এগুলো আমাদের ঠিক পছন্দ হ'ল না। তিনি মা কালীকে দেখেছিলেন, তাঁকে সন্দেশ খাইয়েছিলেন, রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার সময় মা কালী দড়ি পড়িয়ে দিয়েছিল, একথা আমরা বিশ্বাস করি, গল্প করি। আমাদের একবারও মনে হয় না এগুলো মিথ্যে কল্পনা। ঈশ্বর যতবার পৃথিবীতে এসেছেন একটা নির্ধারিত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে। কোন মানুষী মায়ের গর্ভে তাঁকে জন্ম নিতে হয়েছে। মানুষের মতই তাঁকে একটু একটু

করে বড় হতে হয়েছে। তারপর তাঁর ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁকেও জগতের নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাঁরও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। চমকে ওঠার মত কথা, কিন্তু নির্মম সত্য কথা। ভক্তদের ধারণা তিনি সর্বশক্তিমান, অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এগুলো আবেগ কল্পনা মাত্র। আমাদের আধার এবং যোগ্যতার ওপরই সব নির্ভরশীল। ভগবান সর্বশক্তিমান হলে কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব ওইরকম বদ এবং চরিত্রহীন হতো না। রামকৃষ্ণ চেষ্টা করলেই আরো গোটা কতক বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারতেন। একটা নরেনের জন্য এত ছটফট করতেন না। গৌরাঙ্গদেবের স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলতে পারত না। সন্ন্যাস নেবেন জেনেও তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সারাজীবন কাঁদাতেন না। পৃথিবী সৃষ্টির কথা ধরা যাক, ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তাহলে শ্যাওলা থেকে অ্যামিবা এইরকম ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মানুষ করলেন কেন? তাকে আবার শিক্ষা সংস্কারের অপেক্ষায় রাখলেন কেন? একেবারেই পূর্ণ মানব নির্মাণ করতে পারেতেন। জানি ভক্তরা কি বলবেন, ডাক্তারেরা রোগের উৎস খুঁজে না পেলে বলেন অ্যালার্জি। জড়বুদ্ধি ভক্তরা যুক্তি খুঁজে না পেলে বলেন, ওটাই তো লীলা। অর্থাৎ স্ববিরোধিতা মানে গোঁজামিল। আধ্যাত্মিক শক্তিটা যে ভাবের শক্তি কল্পনার শক্তি, বাস্তব জগতে তার কোন মূল্য নেই, এই সত্যটা আমাদের নতুন করে বুঝতে হবে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা এটা না বোঝার চেষ্টা করতে পারেন, কারণ, এটা তাঁদের জীবিকা। আমাদের এই সত্যটা বুঝতেই হবে। না হলে জাতি হিসাবে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, যাচ্ছি।

সোমনাথের মন্দিরে ষাট হাজার সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজনও কি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না? আমি বিশ্বাস করি না। বৃন্দাবনে পঞ্চাশ হাজার বৈষ্ণবকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের কেউই ঠিকমতো জপকীর্তন করেনি, তিলকসেবা করেনি, একথাও ঠিক নয়। সাতশো বছর ধরে আমাদের দেবদেবী, মন্দির, সমাজ আক্রান্ত হয়েছে, আমরা কিছুই করতে পারিনি। সারাদেশে ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিক চর্চা কিন্তু অব্যাহত ছিল। তবু পারলাম না। কারণ লড়াইটা

হ'ল বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার। কল্পনার সঙ্গে কল্পনার লড়াই হলে, মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের লড়াই হলে আমরা অবশ্যই জিতে যেতাম। এমন লীলার অবতারণা করতাম যে সবাই চুপ মেরে যেত। মিথ্যেতে আমাদের সঙ্গে কেউ কোনদিন পেরে ওঠেনি, এখনও পারে না। আজও আমরা দুর্নীতি এবং ভেজালে সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি। এগুলি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘদিনের আত্মপ্রবঞ্চনা আর মিথ্যার বাইপ্রোডাক্ট। সেদিনও আমরা পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করে শক্তি সংগ্রহে মনযোগ দিইনি, জাতিকে সংগঠিত করিনি। পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে গ্রহের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করেছি। শাস্ত্র নিয়ে চুলচেরা তর্ক করে পাণ্ডিত্যের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছি। এসবে নিজেদের ভক্ত এবং পণ্ডিত প্রমাণ করা যায়, আত্মরক্ষা করা যায় না। অস্ত্রের কাছে, শক্তির কাছে এই ভক্তি, ধর্ম, পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নেই। মার খেয়েও এটা আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ, অবাস্তব কল্পনার জগতে আমরা বাস করতে অভ্যস্ত।

ভাবনাচিন্তা-কাজকর্মে আমরা প্র্যাকটিক্যাল নই। প্র্যাকটিক্যাল হলে আমরা বুঝতে পারতাম, পৃথিবীতে মৃত্যুর মত সত্য একটাই তা হচ্ছে শক্তি। সত্যের সঙ্গে শক্তি যুক্ত না হলে সে সত্য মূল্যহীন, মর্য্যাদাহীন, করুণার যোগ্য। এই সরল সত্যটা আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের অসাড় চৈতন্যে প্রশ্ন জাগাতে হবে,—বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা কি আমরা বেশী আধ্যাত্মিক শক্তিধর, না অধিকতর ভক্তিমান ভক্ত? অতবড় তপস্বী হয়েও এঁরা নিজেদের আশ্রম রক্ষা করতে পারতেন না। রাক্ষসেরা যজ্ঞ অপবিত্র করলে, আশ্রম লুঠ করলে এঁরা ছুটে যেতেন রাম লক্ষ্মণের কাছে। তাদের কাছে শক্তি ছিল বলে। দরিদ্রের বড়লোকি কথা, হাবভাব যেমন মনকে চোখ ঠারা, দুর্বলের অধ্যাত্মচর্চাও তেমনি হাস্যকর। শুনতে কষ্ট হলেও এটা ঐতিহাসিক সত্য, হাজার হাজার বছর ধরে ঘরে, পরে আমরা এই প্রবঞ্চনা করে চলেছি। শক, হুন, পাঠান, মোগল যার যখন খুশী আমাদের আক্রমণ করেছে, দখল করেছে, যার যা ইচ্ছে তাই করেছে। খরগোস শিকারে শিকারীর যেমন কোন ঝুঁকি থাকে না, শিকার নিজেই প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করে তারপর মরে। বিদেশী আক্রমণকারীদের চোখে আমরা ছিলাম তাই।

কোন বাদশা ভাবেনি, হিন্দুদের প্রচণ্ড ভগবৎশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি, অতএব ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে প্রতি মুহূর্তে, দরকার নেই আক্রমণের। বরং তারা আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোকেই আক্রমণ করে, ধ্বংস করে স্বজাতির কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে হিন্দুর দেবদেবী এবং ধর্মের কোন শক্তিই নেই। পরবর্তীরা আরও উৎসাহ নিয়ে আমাদের ধর্মস্থানকে আক্রমণ করেছে। ভগবৎ শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। স্বাভিমানী দেশপ্রেমী ক্ষাত্রশক্তির কাছে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাকীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। তারপর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করেছে এবং এখনও করে, এত অত্যাচারের পরও আমরা টিকেতো রয়েছি। পদাঘাত, পলায়ন, আত্মীয় হারানো, দেশ হারানোর বেদনা তার মধ্যে একটুও অপমান, যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না। অস্তিত্ব রক্ষাকেই সে পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। কাপুরুষ, দুর্বলদের ভাবনাচিন্তার ধরণটাই এইরকম হয়। অত্যাচারী, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিশোধের কথা সে ভাবতেও পারে না। অত্যাচারীদের মধ্যেই সে তখন ভালমন্দ খুঁজে নেয়। ইতিহাসে না পেলে নাটকে ভালমানুষ বানিয়ে নেয়। হিন্দুসমাজের সবচেয়ে সর্বনাশ সাধনকারী চরিত্রহীন, যিনি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট মীনা বাজারে মেয়ে সেজে নারী সংগ্রহ করতে গিয়ে রাজপুতানীর কংকনের আঘাতে আহত হন, সেই আকবরকে এরাই মহান আখ্যা দেয়। আজীবন হিন্দুবিদ্বেষী, অসংখ্য হিন্দুমন্দির ধ্বংসকারী, ভ্রাতৃহত্যাকারী, বাবাকে নির্দয়ভাবে যে বন্দী করে রাখে, শুধুমাত্র সিংহাসন লোভে, সেই পাষণ্ড আওরঙ্গজেব সম্পর্কে লেখা হয় তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এই দেশে শতকরা সাতানব্বুই জন মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে, অর্ধেক ভারত পাকিস্তান করেছে। বাকীটা পাকিস্তান করার জন্য প্রকাশ্যে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তবু একদল মানুষ প্রশ্ন তোলেন, সব মুসলমান খারাপ নাকি! ইতিহাসে মুসলিম নির্মমতা, পাকিস্তানে হিন্দুহত্যা, হিন্দু বিতাড়ন কিংবা ভারতে কোন মুসলমানদের কোন অন্যায় আব্দারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে একজন মুসলমানকেও দেখা যায়নি। পূর্ববঙ্গের সব হারানো হিন্দুদের অনেককেই বলতে শুনেছি, মুসলমানেরা আমাদের

ওপর এত অত্যাচার শুধু শুধু করেছে নাকি? নিশ্চয়ই আমাদের কোন অপরাধ ছিল। এ জন্মের না হলে পূর্বজন্মের কোন পাপ ছিল। দুর্বলতাই পাপ, স্বার্থপরতাই পাপ, কাপুরুষতাই পাপ, সংগঠনহীনতাই পাপ, স্বার্থপরতাই পাপ, আত্মকেন্দ্রিকতাই পাপ, একথাটা সে কিছুতেই বুঝবে না।

দাসজাতি, দুর্বল জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক এইরকম হয়। সে প্রকৃত সত্য দেখতেই পায় না। দুর্বল জাতির জ্যোতিষী পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞরাও সেইরকমই হয়। গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ পরাজয়ের অনুকলে দেখতে পায়। মুসলমানদের আস্ফালন দেখলে এই পণ্ডিতেরাই বলে, এতো হবেই। শাস্ত্রেই আছে, "কলি শেষে একবর্ণ হইবে যবন।" এসব কথা কোন শাস্ত্রে নেই, তবু বলে। চীনা আক্রমণের সময় কতজনকে বলতে শুনেছি, "পীতবর্ণ রাজা হবে এ তো শাস্ত্রবচন।" অর্থাৎ বিদেশী আক্রমণের পটভূমিটাকে এরা সহনযোগ্য করে দেয়। নিজেদের দুর্বলতাকে চাপা দেয় শাস্ত্র দিয়ে, ভগবান দিয়ে। এই মানসিকতা আমাদের গোটা জাতির আত্মবিশ্বাস, মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছে, দিচ্ছে। এইরকম লোকেদের বাড়ী একদল ডাকাত পড়ুক, সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যাক, পরিবারের সকলকে হত্যা করুক, শুধু একজনের দুটো হাত কেটে নিয়ে একটা চোখ তুলে নিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখুক। সর্বস্ব লুণ্ঠন, সকলের নৃশংস হত্যা, নিজের হাত কাটা, চোখ তোলার জন্য তার রাগ, ঘৃণা, আক্রোশ কিছু হবে না। তার প্রাণে বাঁচানোর জন্যই সে ডাকাতটাকে পরম দয়ালু মনে করবে। ডাকাতের করুণাকে সে গুরুর কৃপা, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করবে। বলবে, ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ডাকাতটা ইচ্ছা করলেই তো আমাকে মেরে ফেলতে পারত। ডাকাতের ইচ্ছেটাই তার কাছে ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে হবে। দুর্বল, মিথ্যেবাদী মানুষের এটাই জীবনদর্শন। রবিবারে মুসুরীর ডাল খেতে আছে কি নেই, মাছে পেঁয়াজ না দিয়ে রাঁধলেই নিরামিষ, এই নিয়ে কত পণ্ডিতকে তুমুল ঝগড়া করতে দেখেছি। কল্পনা করতে পারি এদের পূর্বপুরুষেরা আরো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন ঝগড়া করেছে, তর্ক করেছে। একাদশীতে কেন কলমি শাক খেতে নেই, কিংবা হাততালি দিয়ে কেন তুলসী তুলতে হয়, এইসব তুচ্ছ বিষয়। পাঠানেরা এসে দুপক্ষকেই পিটিয়ে

মুসলমান করে নিয়েছে। তারপর তাদের আর নামাজ পড়তে গরু খেতে শাস্ত্র বাধা হয়নি। পাঁজি, পুঁথি, চুলচেরা তর্কও ঘুচে গেছে। গোপাষ্টমীতে গরু খেতেও আর কোনপক্ষই আপত্তি করেনি। এই আমাদের তার্কিকতা, পাণ্ডিত্য, শূন্যগর্ভ আস্ফালন, শক্তির সামনে নতমস্তক, আত্মসমর্পিত। শক্তির কাছে সব শাস্ত্র মিথ্যা, অর্থহীন হয়ে গেল। তবু আমরা এই মিথ্যে পরিত্যাগ করতে পারছি না। এরই ফলশ্রুতিরূপে ব্যক্তিজীবন, রাষ্ট্রজীবন ডুবে আছে গভীর নৈরাশ্যের উজ্জ্বল অন্ধকারে। নিজেদের সৃষ্ট মধুর মিথ্যের সমুদ্রে আরও ডুবে আছি।

মিথ্যে আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী শুধুই প্রশংসা এবং গুণকীর্ত্তন। পুরো মানুষটাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহাপুরুষ বলে যেন তার দোষ দুর্বলতা কিছু থাকতে নেই। তাই এদেশের কোন মানুষের জীবনীকে বায়োগ্রাফী বলা যায় না, বলা যায় হ্যাগিওগ্রাফী। মানুষটাকে দেবতা বানাবার অপচেষ্টা। বেশী কথা কি, এদেশের বহু মানুষ একান্তে ডায়েরী লিখতে গিয়েও তারমধ্যে মিথ্যে কথা লেখে। উদ্দেশ্য, বহুদিন পরে এই ডায়েরী যদি কেউ পড়ে সে যেন আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আধ্যাত্মিকতা আর ভক্তির নামে আমরা মিথ্যের শেষ ডিগ্রীতে নেমে এসেছি। প্রশ্ন জাগতে পারে হাজার হাজার বছর ধরে এত মিথ্যে বিনা বাধায় চলে আসছে কি করে? উত্তর আগেই দিয়েছি, আমরা মিথ্যে ভালবাসি বলে। একটা স্থূল উদাহরণ দিই। অনেক অভিনেতা রামকৃষ্ণ সেজে মঞ্চে দাঁড়িয়ে টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে দুটোই ফেলে দিয়ে হাততালি নিচ্ছেন, আর গ্রীনরুমে গিয়ে বলছেন—কই টাকা দাও। বিবেকানন্দ সেজে স্টেজে ভবতারিণীর সামনে বলছে, টাকাপয়সা, ধনদৌলত কিচ্ছু চাইনা মা, আমায় জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও, শ্রদ্ধাভক্তি দাও। সাজঘরে গিয়ে বলছে, সব টাকা মিটিয়ে দাও, নইলে যাত্রা হবে না। এ নাটক চলছে না হাজার রজনী ধরে? তেমনি চলছে আমাদেরও। ধর্মের নামে ভক্তির নামে স্ববিরোধিতা, মানে নিজের সঙ্গে নিজেরই চলছে লুকোচুরি খেলা। তবু ঘুরে ফিরে প্রশ্ন আসবেই। আধ্যাত্মিকতার কি কোন মূল্য নেই, নেই কোন প্রয়োজনীয়তা? নিশ্চয়ই আছে। ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ, রামকৃষ্ণভক্ত, নোবেল

পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী রোমা রোঁলা বড় সুন্দর ভাষায় এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঈশ্বর অনুভূতি, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে একটা উচ্চভাব, ডিভাইন ড্রিম—দিব্যস্বপ্ন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে স্বপ্ন দিয়ে মানুষের কি কল্যাণ হবে? হয় স্বপ্নেও কল্যাণ হয়। ধরা যাক একটা মোটামুটি ভদ্রব্যক্তি দু রাত্রে দুটি স্বপ্ন দেখলো। একদিন দেখলো সে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গল্প করছে, রামকৃষ্ণের পা টিপে দিচ্ছে, বিদ্যাসাগরের তামাক সেজে দিচ্ছে। নানান উচ্চ বিষয়ে আলোচনা শুনছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। মিথ্যে স্বপ্ন মাত্র। দ্বিতীয় দিন স্বপ্ন দেখলো পতিতালয়ের একটি নর্দমায় মদ্য পান করে সে পড়ে আছে। এও স্বপ্ন, মিথ্যে, তবু মুহূর্তে কলুষিত হয়ে যাবে মনটা। নিজের প্রতি একটা ঘৃণার উদ্রেক হবে। এ জন্যও উচ্চভাব দিব্যস্বপ্ন দরকার। এসব শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভাবের ক্ষেত্রে সত্য। সমাজে, বাস্তবে এর কোন উপযোগিতা নেই। পকেটে লক্ষ টাকা আছে মনে করে আনন্দে বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে, গল্প করা যেতে পারে। কিছু মূল্যবান জিনিষ কিনতে গেলেই স্বপ্ন শেষ। আমদেরও ঠিক তাই। যেখানে যুদ্ধ প্রতিযোগিতা সংগ্রাম, সেখানে আমাদের চিত্র বড়ই করুণ। সে ৭০০ বছরের ইতিহাসই হোক কিংবা আজকের খেলাধূলার জগতই হোক। অপমান লজ্জা আর পরাজয় ছাড়া সেখানে আর কোন সঞ্চয় আমাদের নেই। এগুলো উচ্চভাব দিবাস্বপ্ন লীলার অবতারণা আর কীর্তনে অর্জিত হয় না। কল্পনায় কিন্তু এগুলোকেই জীবন বলে মনে করি। কল্পনাকে সত্য মনে করে আঁকড়ে ধরার দীর্ঘকালীন অভ্যাস থেকেই করি। রামকৃষ্ণ মা মা করলে তাঁর গুরু তোতাপুরী ভীষণ রেগে যেতেন। বলতেন, সত্যের, ব্রহ্মের, ঈশ্বরের এইরকম মা-মাসী হয় না। এসব তোদের ভাবের মা, কল্পনার মা। সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। রামকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতেন, এই তো মা চলে গেল, পালিয়ে গেল। একদিন তোতাপুরী ক্রুদ্ধ হয়ে ভাঙা বোতলের কাঁচ দিয়ে রামকৃষ্ণের কপালটা কেটে দিলেন, রামকৃষ্ণ জলে গেল বলে চীৎকার করতেই তোতাপুরী বললেন, কই তোর মা কই, মাকে ডাক। রামকৃষ্ণ বললেন কৈ মাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোতাপুরী বললেন, তাহলে বুঝতে পারছিস, ওটা

তোর কল্পনার মা, ভাবের মা। বাস্তবে এরকম হয় না। তারপর ধ্যানযোগে আত্মস্থ হয়ে রামকৃষ্ণ যথার্থ রামকৃষ্ণ হলেন। এরপর থেকে তিনি আর বিশেষ মা, মা করেননি। তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ জীবনেও মা বলেননি। বলেছেন সব দেবতাকে তুলে রেখে ভারতমায়ের পূজো কর। অর্থাৎ দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র, যা বাস্তব। আমরা কিন্তু রামকৃষ্ণের 'মা' 'মা' অংশটাই গ্রহণ করলাম। আর স্বামীজির কথায় কর্ণপাত করলাম না। কারণ বাস্তবতা আমাদের অস্বস্তি দেয় আর কল্পনা আমাদের বড় প্রিয় বস্তু।

জগদীশ চন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক মানুষ, বাস্তব জগতের মানুষ, অঙ্কের জগতের মানুষ। তিনিও কত অবাস্তব জগতের অধিবাসী ছিলেন ভাবতে কষ্ট হয়। লণ্ডনে থাকার সময় টেলিফোন কোম্পানী নামে একটি সংস্থার প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করে। বলে আপনি বেতারের যেটুকু আবিষ্কার করেছেন তার পেটেণ্ট আমাদের বিক্রী করে দিন, যত টাকা লাগে আমরা দিচ্ছি, আপনি বেতার সম্পূর্ণ করুন। কি সুন্দর প্রস্তাব। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভারতের একটা অক্ষয় অবদান থাকত। বেতারের আবিষ্কর্তারূপে জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম অমর হয়ে থাকত। লক্ষ লক্ষ টাকা পেতেন যা দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে পারতেন। কত রকমের কল্যাণকর্ম করতে পারতেন। কিন্তু জগদীশ বসু কি করলেন? রাত জেগে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন ঃ গুরুদেব এরা আমাকে টাকার লোভ দেখায়, এতবড় স্পর্ধা ওদের, আমি কি বেনিয়া, ব্যবসা করতে এসেছি! আমিও দিয়েছি তাড়িয়ে। প্রায় এরকম ভাষায়। টেলিফোন কোম্পানী বাস্তব জগতে বাস করে। তারা ব্যবসা করতে চায়, চলে গেল মার্কনীর কাছে। যদিও মার্কনী জগদীশ বসুর তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলেন। প্রস্তাব লুফে নিলেন তিনি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মার্কনীর নাম চিরস্থায়ী হয়ে রইল রেডিওর আবিষ্কর্তারূপে। আখের গোছানো রইল চার চোদ্দং ছাপান্ন পুরুষের। তারপর জগদীশ বসু কি করলেন? বাড়ীতে প্রচুর পুরনো ক্যানেস্তারা টিন কিনে নিয়ে এলেন। পুরনো টিন মুড়ে দিলে তার প্রাণে যন্ত্রণা হয় কিনা পরীক্ষা চালালেন। পরীক্ষা চালালেন গাছের প্রাণ আছে কিনা। জগদীশ চন্দ্র বসু আমাদের গৌরব।

তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ কটাক্ষ আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু দেখাতে চাইছি যেহেতু আমাদের চরিত্রে কল্পনার আধিক্য, তাই বিজ্ঞানীরাও বেশীদিন বাস্তব জগতে থাকতে পারেন না। মানুষের প্রয়োজনে লাগে কল্যাণ হয় এমন বহু জিনিষ তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানীরা যা করেছেন। তা না করে তিনি ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ। মহাদেবে জটা হইতে। যা মানুষের কোন কাজে লাগে না। কাজের চেয়ে ভাব আমাদের প্রিয়, সত্যের চেয়ে মিথ্যা, বাস্তবের চেয়ে কল্পনা। জগদীশ বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার না করে যদি বৃহদাকার লাউ কুমড়ো অথবা বেগুন সৃষ্টির চেষ্টা করতেন, এই ক্ষুধাতুর দেশে কত মানুষের উপকার হত, তা তিনি করলেন না। কারণ, কল্পনা আমাদের ঐতিহ্য। ছাড়তে বড় মায়া। বলতে লজ্জা হলেও একথা সত্যি আজ যে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর, অন্য দেশে চাল রপ্তানী করি, চিরকালের দরিদ্র চাষীরাও আজ দু'পয়সার মুখ দেখছে, এইসব চালের স্পেসিস এসেছে চীন জাপান কোরিয়া থেকে। এতে আমাদের কোন অবদান নেই। আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্ম এও আমাদের নিজস্ব নয়। আমরা যে ফ্যান চালাই, আলো জ্বালাই, রেডিও শুনি, টিভি দেখি, সিনেমা দেখি, ভিডিও, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা ব্যবহার করি, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, চিনি, এর একটাও আমাদের সৃষ্ট নয়। যেসব দেশে ভগবান কখনো লীলা করতে যাননি, যেখানে তেত্রিশ কোটী দেবতা নেই, ভক্তির জোয়ার নেই, তাদের অবদান। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে লাগে এমন কিছুই আমরা দিতে পারিনি, শুধু নিয়েছি। ভাবখানা আমাদের কিন্তু এমনই যেন জগত আমাদের ইচ্ছাতেই চলছে, কল্পনাবিলাসী মানুষেরা এভাবেই চিন্তা করে। ভগবানকে আমরা অন্তর্যামী বলি। আন্দাজে বলি। কিন্তু কুঁড়েরা সর্বান্তর্যামী হয় এটা আমরা দেখতে পাই। অলস প্রকৃতির একজন ব্যক্তিকে বলুন কাছাকাছি কোন দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে, সে সঙ্গে সঙ্গে বলবে দোকান বন্ধ। আমাদেরও ঠিক তাই। নিজেদের চরিত্রের অসঙ্গতি দুর্বলতা লক্ষ্য করে চারিদিকে অন্ধকার দেখে অতীতের গহ্বর থেকে খুঁজে নিই মিথ্যে স্বর্ণময় ঐতিহ্য। 'আমাদের সবই ছিল' ভাবনায় বুঁদ হয়ে গোটা জাত আরো নিষ্ক্রিয় হয়। সে

গীতায় টেলিভিশন দেখতে পায়, নারদের ঢেঁকিকে রকেটের সঙ্গে তুলনা করে আনন্দিত হয়, মহাভারতে আণবিক বোমা, রামায়ণে বিমান দ্যাখে। জয়ন্তবিষ্ণু নার্লিকার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেছেন "এসব তৈরীর কৌশল কোন শাস্ত্রে নেই, বিমান শাস্ত্রে বিমানপোত বিষয়ে কোন কথা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বললে কি হবে, আমরা মিথ্যে গল্প চালিয়ে যেতে ছাড়ব না।

যদি এতই আমাদের ছিল তাহলে আমরা জগতকে দিলাম কি? শুধু কিছু গ্রন্থ দিয়েছি, আর যুগ যুগ ধরে দিয়ে চলেছি রাশি রাশি উপদেশ-অলস কল্পনা যা সৃষ্টি করতে পারে। ইওরোপ আমেরিকা জাপান বাস্তব জগতে থাকে। তাই তারা দুধে, মাখনে, মাংসে, প্রাচুর্য্যে ভাসছে, শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে হাসছে। আমরা রোগে, শোকে, অশিক্ষায়, দারিদ্র, অজ্ঞতায়, ভণ্ডামিতে আর ভক্তিরসে ডুবে আছি। কারণ, অবাস্তব কল্পনা আমাদের জীবন। এদেশে এখন সাধু, গুরু, পণ্ডিত, পাণ্ডাদের সংখ্যা আটান্ন লক্ষ, এরা বেশীরভাগ খায় দুধ, ঘি, ফল, সন্দেশ। মলমূত্র ছাড়া কিচ্ছু ত্যাগ করেন না, আর দানের মধ্যে করেন শুধু উপদেশ। এর সঙ্গে অলৌকিক গালগপ্প আর ভাষার প্যাঁচ কষে সবকথার বিচিত্র ব্যাখ্যা। এই খরচে আমরা আটান্ন লক্ষ দেশী গুরুর বদলে যদি বিদেশী গরু পুষতাম এদেশের দুগ্ধাভাব মিটে যেত, ঘুঁটের সমস্যা থাকত না। এগুলো রেগে যাবার মত কথা, কিন্তু বড় নির্মম সত্যকথা। গরুকে আমরা মা বলি, ভগবতী বলে পূজো করি। এদেশে অসংখ্য ভগবতী আছে নিংড়ে দুধ পাই আধকেজি। আর যারা গরু খায় পূজো করে না, তাদের গরু তিয়াত্তর কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়। আমরা তো দুধ চাই না, আমরা গল্প চাই, কল্পনা চাই। সাধুগুরুরা এসব ভালো দিতে পারেন। অতিন্দ্রীয় অনুভূতি জ্যোতির্ময় আলো আর কত কি! এই গল্প দিয়ে আমরা দেশের মানুষের মধ্যে উৎসাহ কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারিনি, দেশের দারিদ্র ঘোচাতে পারিনি। সমগ্র দেশ আমার মাতৃভূমি এই চেতনা সৃষ্টি করতে পারিনি। চরিত্রবান, নিঃস্বার্থবুদ্ধি, নির্ভীক মানুষ তৈরী করতে পারিনি। কোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারিনি। আক্রমণকারীরা অত্যাচারের স্টীম

রোলার চালিয়েছে। আমরা জপ করেছি, কীর্তন করেছি, পালিয়েছি আর মিথ্যের পাহাড় রচনা করেছি। মা-বোন-স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারিনি। তাদের ফেলে আগেই পালিয়ে গিয়েছি। দু'একজনকে পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র বার করেছি, পণ্ডিত ডেকে এনেছি বিচার বসিয়েছি। তারপর পাঁজিপুঁথি খুলে সিদ্ধান্তে এসেছি, ওরা আমাদের মা-বোন হলেও ওদের ঘরে নেওয়া চলবে না। কারণ, বিধর্মীরা ওদের স্পর্শ করেছে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে আর এই ক্লীব সমাজকে অভিসম্পাত দিতে দিতে তারা চলে গেছে অন্য সমাজে।

সংঘাতের মুখোমুখি হলেই আমরা একেবারে দিগম্বর হয়ে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যের চাদর চাপা দিয়ে বলেছি সবই গোবিন্দের ইচ্ছা। এই আমাদের ধর্ম, ভক্তি, আমাদের জীবন। মন্দিরে কম পূজো দেওয়া হয় না অলিম্পিকে একটি পদক পাওয়ার জন্য। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা, পলকে প্রলয় করতে পারা সাধু গুরু নাকি অনেক আছেন এই দেশে। দায়িত্ব নিন না, বেশী নয় একটা গুরু একটি স্বর্ণপদক পাইয়ে দেবেন। বহু জীবন্ত ভগবান ছিলেন পূর্ববঙ্গে। কেউ মাটিকে সন্দেশ বানিয়ে দিতেন, কেউ মরা মানুষ বাঁচিয়ে দিতেন, কেউ শৈশবে হাত নেড়ে ঝড় থামিয়ে দিতেন। পাকিস্তান হওয়া মাত্র তাদের সব বুজরুকি শেষ। ঝড় থামানো মরা বাঁচানো পড়ে রইল, নিজের প্রাণটুকু হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পেলেন না। তবু তাদের বাজার খারাপ হয়নি। কারণ আমরা মিথ্যে ভালবাসি, ভণ্ডামি ভালবাসি। আমাদের কারো মনে প্রশ্নই জাগে না যে গুরুরা নিজের দেশে টিকতে পারে না, প্রাণ বাঁচাতে অন্যত্র পালায়, তাদের সত্যিকারের ক্ষমতা কতটুকু? ভূপালে কতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হাজার হাজার জাতক মারা গেল অসহায়ভাবে। ত্রিকালদর্শী সাধু এবং ভবিষ্যতদ্রষ্টা জ্যোতিষসম্রাট এদেশের পথে ঘাটে। এদের সব শক্তি নিয়েও কেউ বলতে পারেননি ভূপালে একটা দারুণ দুর্যোগ আসছে, তোমরা সব সাবধান হও। এদের প্রতিই আমরা নির্ভরশীল। কারণ কপটে কপটে আমরা ধূল পরিমাণ। শিষ্যরা নিজেদের ভালো করেই চেনে এবং এইসব সাধুগুরুদের জানে, তাই কোন অসুবিধে হয় না। তিনজন ভগবৎতুল্য গুরুর কথা বলি, তিনজনই সাধুদের ভাষার অপ্রকট অর্থাৎ মারা গেছেন। প্রথমজন

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে দুটি স্পিরিট অর্থাৎ আত্মা সংগ্রহ করলেন, যারা দুটি বিশমনি পাথর মাথায় করে নিয়ে গুরুর সঙ্গে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে। সারাজীবন অদৃশ্য থেকে শূন্যে পাথর নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ালো। কার কি লাভ হল জানি না, শিষ্যদের চোখে ইনি দারুণ শক্তিমান, চোখে না দেখেও একথা শিষ্যরা বিশ্বাস করে। তখন বৃটিশ আমল, এই পাথর ছুঁড়ে যদি দুটো লাটসাহেবকে মারার ব্যবস্থা করতেন এই সাধু, তাহলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন করতে হ'ত না। উড়ন্ত বিশমনি পাথর দেখেই বৃটিশ পালিয়ে যেত। এইসব অর্থহীন গালগল্প লেখা হয়, ছাপা হয়। আমাদের এগুলো বলতে এবং শুনতে ভাল লাগে। দ্বিতীয় গুরুর দেহান্ত হয়েছে বছর পঁচিশ। হাঁটুতে প্রচণ্ড বাত। সাধারণ পায়খানায় বসতে পারতেন না। একটি কমোডে পায়খানা করতেন। অনেকদিন ব্যবহারের ফলে সেটি একটু ভেঙেচুড়ে গিয়েছিল। একজন শিষ্য একটি নতুন কমোড কিনে দিয়ে গেল। দু'একদিন পরে মিস্ত্রী এসে পুরনোটা পাল্টে নতুনটা ফিট করে দিয়ে যাবে, একদিন রাত্রে পুরনো কমোডটি বিশুদ্ধ বাংলায় গুরুদেবকে বলছে, প্রভু এতদিন আপনার সেবা করে এলাম আর আমাকে আপনি বিনাদোষে ত্যাগ করছেন? গুরুদেব নির্দেশ দিলেন কমোড পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এই কাহিনী শুনিয়ে শিষ্যরা বলেন ঃ তাহলে বুঝতে পারছেন চৈতন্যময় ব্যক্তির স্পর্শে জড়বস্তুও চৈতন্যময় হয়ে যেতে পারে। এইসব শিষ্যদের ভক্তি এত বেশী যে যুক্তি দিয়ে কোন ঘটনার বিশ্লেষণ এরা করতে পারে না। নইলে এদের মনে হ'ত সারাদেশ আজ অচৈতন্য, মানুষের মধ্যে চৈতন্য সৃষ্টি না করে যে গুরু পায়খানাকে চৈতন্যময় করেন, সত্যিই এদেশে এরকম গুরুর আদৌ প্রয়োজন আছে কি! বাতে অসাড় হয়ে যাওয়া হাঁটু দুটিতে চেতনার সঞ্চার করলে পুরো সমস্যাটারই সমাধান হয়ে যায় একথাও ভক্তদের মনে হবে না। গুরু করুন আর না করুন একথা ফলাও করে বলার মত ভক্তশিষ্য এদেশে যথেষ্ট রয়েছে। বলার পর তার মনে হয় এগুলো মিথ্যে নয় সত্যি বলছি। তৃতীয় সাধু একদিন সন্ধ্যায় জপ করতে করতে 'হেই হেই' করে চিৎকার করে উঠলেন। শিষ্যরা ছুটে এসে জিগ্যেস করলো কী হয়েছে বাবা? সাধু বললেন, না কিছু

নয়, বিপদ কেটে গেছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মন্দিরে ছাগল ঢুকে পুঁইগাছ খাচ্ছিল, তাড়িয়ে দিলাম। অনেকে পুঁইগাছ না বলে তুলসীগাছের কথা বলেন। এ ঘটনা বিবরণ দিয়ে ভক্তের গদগদ জিজ্ঞাসা, বলুন তো এই সাধুর কি তপঃশক্তি কি অন্তর্দৃষ্টি? এদেরও বিনীতভাবে বলার কেউ নেই যে, এইধরণের সাধুও এদেশে নিষ্প্রয়োজন। এ সাধুর দেহান্ত হয়েছে শতাধিকবছর। পঞ্চাশ বছর পরে অর্ধেক ভারতবর্ষ খেয়ে নেবে বিধর্মীতে, এ সম্ভাবনা তাঁর চোখে পড়ল না। দেশের মানুষের চরিত্র বলে কিছু থাকবে না, মানুষের মুখের ভাষা হয়ে উঠবে খিস্তি, এগুলো কেউ বুঝতে পারলেন না। সারাজীবনের তপস্যা দিয়ে সাধনা দিয়ে ভক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন পাঁচ নয়ার পুঁইডাটা।

এইসব গল্প আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছি এবং করে যাব। অধিকাংশ সাধুগুরুকে কেন্দ্র করে আমরা এই মিথ্যে গল্প চালু রেখেছি। কারণ এই মিথ্যা আমাদের মেরুদণ্ডের মজ্জার মধ্যে মিশে আছে। এগুলো আমাদের মনে এক ধরণের আনন্দ দেয়। কোন প্রশ্ন সন্দেহ মনের মধ্যে জাগাতে পারে না। খাইবার গিরিপথ দিয়ে মোগল, পাঠান, তুর্কিরা যখন আসছিল ভারত জয় করতে, ধ্যান যোগে দেখে ওখান থেকেই তাড়িয়ে দেবার মতো একজনও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধুর দেখা পাওয়া যায়নি। পালাবার সাধু দেখা গিয়েছিল অনেক। ইংরেজ যখন জাহাজে করে আসছিল ব্যবসার নামে দেশ দখল করতে, কেউ বুঝতে পারেননি। স্বাধীন খণ্ডিত ভারতে চীন, পাকিস্তান যখন আক্রমণ করল তখন যোগবলে সীমান্ত থেকেই তাদের তাড়িয়ে দেবার মত একজনেরও কথা শোনা যায়নি। যত কাহিনী নির্বোধ শিষ্যদের কাছেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধুসন্তের অন্তর্দৃষ্টি তপঃশক্তি অলৌকিকতা সমাজের রাষ্ট্রের কোন কল্যাণে লাগে না। শুধু ভক্তদের মুগ্ধ করার জন্য আর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য গল্প আর বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নামনামী অভেদ্য, নামই সব, একাথা আমরা বিশ্বাস করি। কথাটা ভিত্তিহীন মিথ্যে বলেই ভাল লাগে। মনে মনে কিংবা প্রকাশ্যে নাম করেন না এদেশে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। নাম যদি সত্যনিষ্ঠ নীতিপারায়ণ তেজস্বী ধার্মিক

মানুষ তৈরী করতে পারত, তাহলে চারপাশে কিছু অন্ততঃ সেইসব লোককে আমরা দেখতে পেতাম যারা প্রতিটি অফিসে কারখানায় স্কুলে কলেজে দুর্নীতি ঘুষ কাজ ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। সর্বত্র যেসব ফাঁকিবাজ ঘুষখোর অফিসার বা অফিস কর্মী দেখি এদের বড় অংশটাই নামজপ কীর্তনাদি করে থাকেন। আচরণে নামের কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না। নামনামী অভেদ্য হলে টাকা এবং টাকা শব্দটিও তাহলে এক। তাহলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি সারাদিন টাকা টাকা করলে সন্ধ্যেবেলা কেন সে টাকার বস্তা পাবে না। এইজন্য পাবে না যে এগুলো মিথ্যেকথা। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নাম পঞ্চাশ বছর জপ করলেও কোন মানুষ শিক্ষিত হবে না। তারজন্য একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বিশ্বশ্রীদের নামকীর্তনে সুদেহী হওয়া যায় না, নিয়মিত ব্যায়াম করতে করতে হয়। আসলে আমরা চাই পরিশ্রমবিমুখতা বাস্তববিমুখতা অদৃশ্য নির্ভরতা। তাই ভক্তি বৈরাগ্য নামের কথা বলে আমরা পালাতে চাই পরিস্থিতি থেকে, বাস্তব অবস্থা থেকে। ঈশ্বর কে কত নামজপ করল দেখেন না। আচরণ দেখেন, কাজ দেখেন। খুব নাম করতো সুবল শ্রীদামেরা, কৃষ্ণ সেখানে যেতেনই না। আর না ডাকতেই চলে যেতেন ভীমার্জুনের কাছে। তারা কীর্তন করতো না, নাম করতো না, কাজ করতো। ভগবানও কাজের লোক চান, ফালতু লোক নন। গীতায় কীর্তনের কথা নেই। ভক্তিতে গদগদ হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলা, কীর্তন করতে করতে গড়াগড়ি দেওয়া 'তারপর অচৈতন্য হয়ে যাওয়া' এইসব বাহাদুরীর কথা কৃষ্ণ গীতায় বলেনি। নামে সব হলে অর্জুনকে কৃষ্ণ যুদ্ধের পরামর্শ দিতেন না। বলতেন, কুরুক্ষেত্রে পাঁচভাইকে নিয়ে সতেরো দিন ধরে অখন্ড নামসঙ্কীর্তন কর আর শেষদিনে মচ্ছব, তোমাদের জয় নিশ্চিত। যেখানে ধনুর্ধর পার্থ থাকে, যোগেশ্বর তুষ্ট থাকেন সেখানেই। কোন ভাল কীর্তনীয়া কিংবা দক্ষ খোল বাদকের কাছে থাকার কথা তিনি বলেননি। ঠাকুর দেখতে দেখতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা, কীর্তন করতে করতে মূর্ছা যাওয়া-এগুলোকে ধর্মভাবের উচ্চ অবস্থা বলে মনে করি। এগুলো চিত্তের অসংলগ্নতা, দুর্বলতা এবং ঘোর তামসিক ভাব থেকে উৎপন্ন এক ধরণের ব্যাধি। যে ব্যাধি আজ সারাদেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে। যে

ব্যাধির প্রাবল্যে হারিয়ে যাচ্ছে চক্রধারী রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ভেসে উঠছে নৌকাবিলাস আর রাসলীলার শ্রীকৃষ্ণ। হারিয়ে যাচ্ছে কাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বীর্য্যবান গৌরাঙ্গ, যিনি বলে গেলেন "সঙ্ঘে শক্তি কলৌযুগে"। কলিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি চাই। সে গৌরাঙ্গ আমাদের পছন্দ নয়। দুহাত তুলে মেয়েলি ভঙ্গীতে দরবিগলিত ধারায় কীর্তন করা গৌরাঙ্গই আমাদের প্রিয়। এ ব্যাধি দেশের সর্বত্র। আর এর সবগুলির যোগফল ক্লীবতা।

অর্জুনকেও এই ব্যাধি একসময় আচ্ছন্ন করেছিল। তাই অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিল, সখা, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি দূর গ্রামে গিয়ে ভিক্ষে করে খাব। আত্মীয় হত্যা করে রাজ্যলাভ আমি চাই না। নিরুপদ্রব শান্ত জীবন চেয়েছিল অর্জুন। কৃষ্ণ একথা শুনে বলেননি, তোমার মধ্যে যথার্থ বৈরাগ্য এসেছে অর্জুন, এই নাও খঞ্জনি আর গেরুয়া। তুমি গ্রামে গিয়ে অহোরাত্র কীর্তন করে পাড়ার লোককে বিনিদ্র রেখে দাও, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ কর। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ এসব বলেননি। বলেছিলেন ক্লীব। দেশের প্রতি ধর্মের প্রতি অনাচার দুঃখকষ্ট যাকে পীড়িত করে না, দেশের দুঃসময়ে যে ক্ষাত্রতেজ অবলম্বন না করে কীর্তন ভজনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় সে ক্লীব। হৃদয়ের দুর্বলতা থেকে ক্লীবতার উৎপত্তি। এই দুর্বলতা পরিত্যাগই ধর্ম। দুর্বলতা ত্যাগ করিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবরা অকারণে কাঁদে, শুধু বৈষ্ণব কেন, অনেক ধার্মিক লোক ভাব এলে কাঁদে। কৃষ্ণ অর্জুনকে পুত্রশোকেও কাঁদতে দেননি। বলেছেন, অভিমন্যুকে দাহ করে অস্ত্র ধারণ কর। আমাদের ধর্ম মিথ্যে অলীকতা আর অলৌকিকতার পিছনে ধাবমান। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন বুদ্ধি ও কৌশল। অলৌকিক শক্তি নয়। আমরা বিপদ দেখলে নামজপ করি, মাদুলী তাবিজ নিই। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে গ্রহের অবস্থান জিজ্ঞাসা করি। শনি, সন্তোষীর পূজো করি। এগুলোই আমাদের ভক্তি, ধর্ম বিশ্বাস। অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাস। পাথরে মাদুলীতে বিশ্বাস। খন্ড খন্ড বিশ্বাস যে বিশ্বাস নয়, সন্দেহ, একথা বোঝার মত শক্তি আর আমাদের নেই। কৃষ্ণ একদিনও অর্জুনকে বলেননি, আজ দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ, আজ একটা বড় আমড়ার আঁটি রূপোর খোলে

ধারণ করে নাও। 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ' করে দ্রোণকে বধ করেছেন। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শিখন্ডীকে খাড়া না করে করে কৃষ্ণ বলতে পারতেন অর্জুন, পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর, আজ সকাল থেকে বেশ ভাল করে একটা শনিপূজা কর কিম্বা সত্য-নারাযণ দাও। আমরা কিন্তু এগুলোই করে থাকি। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জন ছিল পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদী। তাদের সারাটা জীবন কেটেছে দুঃখে, কষ্টে, যুদ্ধে, বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে, পুত্রশোক আর আত্মীয়বিরোধে। শেষে একে একে হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থান। প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের এগুলোই পুরস্কার। এতে দারুণ কষ্ট, খুব যন্ত্রণা, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এগুলো এড়াতে গেলে বলতেই হয় নামনামী এক অভেদ্য। কারণ কাজে ঝুঁকি থাকে, নামে কোন ঝুঁকি নেই। সবকিছু ফাঁকি দিয়ে ভক্ত সেজে নিজেকে ধার্মিক বলে চালানো যায়। নামে কিচ্ছু হয় না। ফুঁপিয়ে কান্না ভক্তি নয়। তাই কৃষ্ণ এগুলো করতে বলেননি। মিথ্যে বলে সহজ বলে আমরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে গীতাকে বাদ দিয়ে তাঁর শুধু নামটা নিলাম।

অনেক শাস্ত্র জানলে পন্ডিত হয় এ ধাবণা আমাদের বদ্ধমূল। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যিনি জীবিত এবং মৃত কোন ব্যক্তির জন্য শোক করেন না, তিনিই পন্ডিত। গীতার আলোয় যদি একবার আমাদের পরিচিত পান্ডতদের দেখে নিই, কি দেখতে পাব? মানুষ দূরের কথা একটা সিকি হারিয়ে গেলে একবেলা খুঁজবেন, তিনমাস শোকস্মৃতি বহন করবেন। জনে জনে বলবেন চকচকে সিকিটা হারিয়ে গেল। আর কি আছে? শুচি অশুচি ছুৎমার্গ আর খাদ্য বিচার। খাদ্যের ওপর দিয়ে পিঁপড়ে ইঁদুর আরশোলা হেঁটে চলে গেলে দোষ নেই, মাছি বোলতা স্পর্শ করলেও চলবে। মানুষে ছুঁলেই অশুচি। যদি সেই মানুষটা তার বর্ণের না হয়। নোংরা কাপড় অস্নাত দেহ চরিত্রহীন ব্যক্তির দোকান থেকে মিষ্টি আনলে তা পবিত্র শুচি। তখন কোন বিচার নেই। চরিত্রবান মানুষ নিষ্ঠা সহকারে বাড়ীতে কিছু তৈরী করে দিলেই অশুদ্ধ। পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, খাদ্যবিচার নিশ্চয়ই দেখা উচিত। সেটা যখন যুক্তিহীনতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তখন তা সমালোচনার যোগ্য হয়। মহত্ত্ব, ত্যাগ এবং অন্যান্য

গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের পন্ডিতরা ব্যঙ্গ কটাক্ষের শিকার হন। সমাজের মধ্যে বিভেদ এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বেদনার হলেও সত্য এই ধরনের পন্ডিত এখনও আমাদের সমাজে কিছু আছে। অভিমান এবং অহঙ্কারসর্বস্ব। তিনি ছাড়া অন্য পন্ডিতগুলো কিছুই জানে না এ ধারণা বহু পন্ডিত পোষণ করেন, প্রকাশ করেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা সংস্কৃত। এই সংস্কৃত বহু ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের অন্ন যোগায় এখনো, সেই ভাষাকে মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার জন্য একটা দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন না এঁরা। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য স্বরচিত জগতে বাস করা এই মানুষগুলোকে আমরা পন্ডিত বলে মনে করি। মিথ্যে বলেই করি। শোক তাপ যন্ত্রণা দুঃখকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা হোমযজ্ঞ মাদুলী কবচ বিপত্তারিণী কি না করি। শাস্ত্র কতরকম স্তোত্রের ব্যবস্থা করেছে। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, যতই কর সুখদুঃখ শোক তাপ তোমাকে নিত্য সহ্য করতে হবে, হচ্ছেও। তবু আমরা এগুলো করে চলেছি। কারণ আমাদের ভাবনাচিন্তার উৎস সত্য নয় ধর্ম নয়, অজ্ঞতা ভয় এবং ভন্ডামি। প্রসাদ সম্পর্কে আমাদের কি পবিত্র ধারণা। ভোগরান্না নৈবেদ্য সাজানো ফল কাটা থেকে শুচিতার শুরু। পট্টবস্ত্র স্নান কতজনের স্পর্শ বাঁচিয়ে দেবতার দৃষ্টি দিয়ে তৈরী হয় প্রসাদ। কতবার মাথায় বুকে ঠেকিয়ে আমরা তা গ্রহণ করি। এতে নাকি বহু আধি ব্যাধি দূর হয়। এগুলো আমাদের বিশ্বাস। যদিও বাসি পচা প্রসাদ আর আটা গোলা সিন্নি খেয়ে অনেক মানুষ অসুস্থ হয় এটা ঘটনা। প্রসাদ খেয়ে মানুষ মারা গেছে এরকম সংবাদ আমরা খবরের কাগজেও পড়ি। প্রসাদ সম্পর্কে গীতার বক্তব্য কি? সম্পূর্ণ বিপরীত। গীতা বলছে এগুলো প্রসাদ নয়, মন এবং ইন্দ্রিয়কে বশ করাটাই প্রসাদ গ্রহণ। আমরা সত্য এড়াতে চাই তাই গীতোক্ত প্রসাদে আমাদের আগ্রহ নেই। অমৃত আমাদের জীবনে একটা মিথ। দেবাসুরের অমৃত নিয়ে লড়াই। অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান, যে কোন স্বাদিষ্ট বস্তুকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা। এই অমৃত লাভের জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধন, কত আয়োজন। এটা তো মিথ্, গড়ে তোলা ধারণা। এর রিয়েলিটি কি? সত্য কি? গীতা বলছে যিনি সুখ

এবং দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই অমৃত লাভ করেন। ফোঁটা, তিলক, দাড়ি নয়, জপ, অখন্ড নামযজ্ঞ নয়, সুখদুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা। আমাদের অভ্যস্ত মিথ্যে ধারণার সঙ্গে এগুলো মেলে না। কারণ, সত্য থেকে আমরা শত যোজন দূরে সরে এসেছি। শ্রেয়োলাভ বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভের জন্য আমরা বারব্রত, মানসিক, একাদশী, অমাবস্যা পালন করি। গঙ্গায় পয়সা ফেলি, কোথাও ইঁট বেঁধে দিই, মাটির ঘোড়া দিই। এতে কোন মঙ্গল হয় গীতা কিন্তু বলেনি। গীতা বলছে একে অন্যের উপকার করলে মঙ্গল সাধিত হয়। অর্থাৎ সমাজ চেতনা। অন্যের প্রতি সহানুভূতি, মমত্ববোধ, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—এই উপলব্ধি। প্রকৃত কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত এটা কৃষ্ণের ধারণা। আমাদের ধারণা অপরের মঙ্গল করলে আমার কি মঙ্গল হ'ল? আমার মঙ্গল আগে চাই। তাতে অন্যের অমঙ্গল করতেও আপত্তি নেই। আমাদের অনেকের বিশ্বাস শরীরকে নিপীড়ন করলে কষ্ট করলে ধর্ম হয়। তার জন্য কেউ তিনবার স্নান করেন, একবার আহার করেন, উপবাস করেন। কেউ কোমড়ে কাঠের চাকা, বালিশের পরিবর্তে মাথায় ইঁট দিয়ে শুয়ে থাকেন। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন এগুলো তামসিকতার তপস্যা। এতে মানুষ মূঢ়সতি অর্থাৎ জড়বুদ্ধি হয়। দেশজুড়ে বিপুল ধর্মচর্চার সঙ্গে যুগপৎ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। মূঢ়তার, স্থূলতার, পেশীর আস্ফালন। অর্থাৎ ঘোরতর তামসিকতা। পাড়ায় পাড়ায় অঙ্গুলিমেয় জড়বুদ্ধি ষন্ডের কাছে সারা সমাজ আত্মসমর্পণ করেছে, করেছে সমাজের বেশীরভাগ মানুষ ধার্মিক ভাল বা ভদ্র বলে নয়, ভন্ড বলে। ষন্ড এবং ভন্ডের সংঘাতে ষন্ডরাই জেতে। আমরা ভন্ডেরা পালিয়ে যাই। পালিয়ে গিয়ে দেশ সমাজ রাজনৈতিক দল শিক্ষাব্যবস্থার শ্রাদ্ধ করি। আর আমরা ছোটবেলায় গোপাল অতি সুবোধ বালক ছিলাম, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানিনা গোছের স্মৃতিচারণ করি, এদের গুন্ডা-সমাজবিরোধী বলি। অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে থেকে। সামনাসামনি হয়ে গেলে বড় স্নেহের সঙ্গে বলি, আমার ছাত্র। ছাত্র না হলেও বলি। রাজনৈতিক নেতা হলে বলি হীরের টুকরো ছেলে সব।

সমাজবিরোধী কিম্বা গুন্ডারা একটি সত্যকে সংগ্রহ করেছে সেটা হচ্ছে শক্তি, আর তারা ভন্ড নয়। তাদের সাহস আছে ঝুঁকি নিতে পারে। আর আমরা! আমাদের চোপ বলবারও দরকার নেই, তার আগেই গলবস্ত্র। শক্তি ছাড়া কোন বস্তুর মূল্য নেই। এই কথাটা আমরা ভুলে গেছি। মনে করিয়ে দিলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। ঠিক এই কারণেই আমরা বাইরের সমাজের কাছে আক্রান্ত হচ্ছি। নিজের সমাজের গলিত অংশটাই আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। যারা এদেশে শিক্ষিত ভদ্র ধার্মিকরূপে পরিচিত, তারা কিছুতেই শক্তি সংগ্রহ করতে চান না, সংগঠিত হতে চান না। তাই যিনি যত ভদ্র তিনি তত ভীরু অসহায়। এই সত্যকে অস্বীকার করা, আত্মপ্রবঞ্চনা করা।

যে দেবতারা আমাদের উপাস্য, যাদের গুণের শেষ নেই, তারা যখন সমাজ সম্পর্কে চেতনা হারাল, সংগঠন হারাল, বর্বর অসুররা তাদের মেরে করে দিল স্বর্গচ্যুত। দেবতারা ব্যাপারটা বুঝে সংগঠিত হয়ে আবার স্বর্গের কর্তৃত্ব ফিরে পেল। দেবী দশভূজা সেই সংগঠিত দেবসমাজের প্রতীক। দুর্গাপূজায় আমরা ভক্তি আনন্দ ঠিকই করি, শুধু এই ইঙ্গিতটা বোঝার চেষ্টা নেই। অনেক মানুষের ধারণা, আমি সৎলোক কারও ক্ষতি করি না, ভগবান আছেন মাথার ওপর, আমার কে কি করবে। এরাও একধরণের আত্মঘাতী মানুষ। পুরাণ কিম্বা ইতিহাস থেকে এরা কিছু শিখতে চায় না। দেবতারা কার ক্ষতি করেছিল, যার জন্যে বারবার অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ত? হিন্দুরা কবে কোন ধর্মকে আঘাত করেছে, কার মসজিদ ভেঙ্গেছে, গীর্জা ভেঙ্গেছে, নারীহরণ করেছে, গায়ের জোরে ধর্মান্তরিত করেছে? এসব তো করেইনি, বরং আশ্রয় প্রার্থী ইহুদী, পার্শী, আক্রমণকারী মোগল পাঠানকে সমানভাবে গ্রহণ করেছে। তাতে আমাদের প্রতি কেউ সদয় ব্যবহার করেছে, ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয় না। আমরা এইসব ঘটনা আড়ম্বরের সঙ্গে গল্প করে প্রমাণ করতে চাই আমাদের ঔদার্য্য। আসলে এগুলো দুর্বলতা। ইহুদীরা জন্মভূমিতে ফিরে গেছে। সামান্য সংখ্যক পার্শী ছিল আমাদের সমাজে মিশে গেছে। বাকীরা আরো উৎসাহ নিয়ে আমাদের সমাজকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশব্যাপী খৃষ্টানী চক্রান্ত মুসলিম ষড়যন্ত্র আজ

প্রকাশ্য ব্যাপার। এই চক্রান্ত সফল করার জন্য সারা পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্র খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলো ঢেলে টাকা দিচ্ছে। আমাদের ঔদার্য্য তাদের চোখে দুর্বলতা। দুর্বলকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, হয় করুণা নয় ঘৃণা করে। দুর্বলতা কাপুরুষতা পাপ। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই সৃত্যু। আমরা সব জেনেশুনে পাপের চাষ করে চলেছি। মৃত্যুর ফসল ফলছে। মানুষ চলে যাচ্ছে অন্য ধর্মে, মেয়েরা চলে যাচ্ছে অন্য সমাজে। দেশের জমি নিয়ে নিচ্ছে অন্য রাষ্ট্র। আজ আমাদের দেশের সীমা, হৃদয়বত্তা সব সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দুর্বলতা পাপ বলে দেবতারাও দুর্বলের প্রতি উদাসীন। দেবতারা একবার এক আলোচনায় বসলেন। বিষয়, আমাদের পূজোয় আমিষযুক্ত করা দরকার, বলির দরকার। সংস্কৃতে শ্লোক আছে, "অশ্বং নৈব গজ নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈব চ, অজাপুত্র বলিং দদ্যাৎ দেব দুর্বল ঘাতকা" অস্যার্থ, ঘোড়া চলবে না কোথায় চাঁট মারবে ঠিক নেই, হাতি এককোপে কাটা যাবে না অতএব বাদ। বাঘ তো কখনই নয়, বাঘ ধরবে কে? বাঘ বলির ব্যবস্থা করলে মানষ পূজোই তুলে দেবে। অনেক বিচার বিবেচনার পর দয়ালু দেবতারা ঠিক করলেন ছাগলকে বলির পশু নির্ধারণ করা হ'ল। ছাগলের অপরাধ সে কাউকে আক্রমণ করতে পারে না। তার শিংএ ধার নেই, দাঁতে বিষ নেই, নিরামিষভোজী নিরীহ। এককোপে কাটা যায়, শুধু দুর্বল বলেই ছাগল পশুত্বের প্রতীক হয়ে গেল, কামনা বাসনার প্রতীক হয়ে গেল। বাঘ সিংহ হিংস্র নরখাদক, তাদের পশুত্বের প্রতীক বলতে পারলাম না, বীরত্বের প্রতীক বললাম। কেউ সাহস-শক্তির পরিচয় দিলে তাকে আমরা সিংহশিশু, বাঘের বাচ্চা বলি। দুর্বল ভীরু মানুষদের লজিকই আলাদা। সে বলবানের পদলেহন করবে, আর তারচেয়ে কেউ দুর্বল হলে তাকে পদদলিত করবে। বিবেকানন্দ বলেছেন একথা, আমার কথাও তাই। একটা আংটি কিংবা কিছু টাকা চুরি করলে তাকে আমরা চোর বলি, শাস্তি দিই। একটা রাজ্য চুরি করলে তাকে আমরা রাজা বলি। মূর্খ বর্বর দস্যু লুণ্ঠকদের আমরা বাদশা বলেই একদা মেনে নিয়েছিলাম, শুধু আমাদের সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধের শক্তি ছিল না বলে। একটা খুন করলে তাকে আমরা খুনী বলি, দেশের আইন তাকে ফাঁসী

দেয়। হাজার হাজার খুন করতে পারলে তাকে আমরা বীর বলি, সম্রাট বলে বন্দনা করি। পরাজিত দুর্বল দাস মানসিকতার মানুষদের এটাই লজিক। মানুষ দুর্বল হলে জাতি দুর্বল হলে সে কারো না কারো হাতে অত্যাচারিত হবেই, মরবেই। মরবার আগে সে যত পরিমাণে পারবে মিথ্যেকে জড়িয়ে ধরবে, কৌশল অবলম্বন করে শেষে বড় অমর্য্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নেবে। ভারতের মূল সমাজ হিন্দুসমাজের গোটা পরম্পরায় এক দৃশ্য এক ছবি— শক্তিহীনতার ছবি, মিথ্যের ছবি।

আমরা অনেকেই বলে থাকি শব্দ ব্রহ্ম। বহু পন্ডিতও বলে থাকেন। আমরাও বিশ্বাস করি, মিথ্যে বলেই বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। কিন্তু ভেবে দেখিনা, ব্রহ্ম সৃষ্টি করা যায় না, শব্দ সৃষ্টি করা যায়। ব্রহ্ম নিজেই একটি গোলমেলে জিনিষ, তার ওপর শব্দ ব্রহ্ম বলে আর এক গোলমাল পাকিয়ে তুলি। আসলে দুটোই বুঝিনা। আর আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে ব্যাপারগুলো আমরা মোটেই বুঝিনা তা নিয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি। বিশেষভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এদেশে এক একজন বিশেষজ্ঞ। অনেক পন্ডিতকে প্রশ্ন করতে দেখেছি, শব্দ ব্রহ্ম নয়? শব্দের প্রতিক্রিয়া নেই? যদি আপনাকে শূয়োরের বাচ্চা বলি আপনি গরম হয়ে যাবেন কিনা বলুন? আমাকেই বলেছিলেন এক পন্ডিতম্মন্য ব্যক্তি। আমি বলেছিলাম, নিশ্চই ক্রুদ্ধ হ'ব। কিন্তু আপনি যদি বলেন তুমি পবিত্র হও, চরিত্রবান হও, আমি হচ্ছি না। তাহলে কি সিদ্ধান্তে আসতে হবে, শব্দ ব্রহ্মের প্রতিক্রিয়া শুধু "শূয়োরের বাচ্চা" শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ আমরা এইসব কথার সত্যাসত্য নিয়ে তলিয়ে ভাবি না। ভেবে দেখি না, ছেলেমেয়েদের মা ও বাবারা ছোট্ট বয়েস থেকে যত ভাল ভাল কথা বলেন, যত সদুপদেশ দেন, শব্দ ব্রহ্ম হলে এবং তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকলে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সারদামণি, নিবেদিতা হওয়া উচিত ছিল। হয় না, কারণ তারা দেখে শেখে। উপদেশের উপযোগী বাবা মায়ের চরিত্র দেখলে, আচরণ দেখলে, ব্যক্তিত্ব দেখলে তারা খানিকটা শেখে। আজকালকার ছেলেছোকরাদের বিরুদ্ধে আমরা নানাধরনের অভিযোগ

আনি। তারা তো সবকিছু আমাদের দেখেই শেখে। আমাদের উত্তরসূরীরাতো আমাদের হেরিডিটি ও এনভায়রনমেন্টের যোগফল। মুনিঋষির বংশধরেরা এত অধঃপতিত হয় কি করে? আমরা একটা মিথ্যে স্ববিরোধী ভন্ডামীর জীবন বহন করে চলেছি বলেই। পূজোর আসনে বসা বাবা, পাওনাদার এলে ছেলেকে শিখিয়ে দিচ্ছে বলে দে, বাবা নেই। মেয়ের বাড়ীতে ছেলের বাবা গর্বের সঙ্গে বলেছে, দেখুন, আমার ছেলে মাইনে তিনশো টাকা পেলে কি হবে, উপরি রোজগার হাজার টাকা, অর্থাৎ চুরি। পাড়ার ছেলে এসে অভিযোগ করছে, দেখুন কাকু আপনার ছেলে রাজু আমার পেন্সিল চুরি করেছে। রাজুর বাবা পদস্থ সরকারী অফিসার। গম্ভীর স্বরে বললেন, রাজু পেন্সিল চুরি করতে তোমার লজ্জা করে না, আমি তোমাকে অফিস থেকে গাদাগাদা পেন্সিল এনে দিই। মিথ্যে, ঘুষ, অফিস থেকে পেন্সিল আনা যেন একটা সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, কোন অপরাধের বিষয় নয়। আমাদের দেখেই ছেলেরা শিখছে। এই ছেলেরা আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলেই অভিযোগ করছি আমরা—বাপমায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, আনরেষ্ট।

অনেকের অভিযোগ আজকের যুবকেরা অভিনেতাদের অনুকরণ করছে। আমার তো মনে হয় তারা ঠিকই করছে। আমাদের সমাজে অধ্যাপক, শিক্ষক, নেতা, ব্যবসায়ী, সাধুসন্ন্যাসী, পিতামাতা কেউই নিজের নিজের ভুমিকা ঠিকমতো পালন করছেন না। একমাত্র অভিনেতারাই তাদের ভুমিকা সঠিকভাবে পালন করে থাকেন। রামকৃষ্ণের চরিত্র থাকলে বামাক্ষ্যাপার মতো অভিনয় করলে চলে না। তাই তারা অভিনেতাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। জনগণও এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করছে। এটা যদি দোষের হয়, সে দোষ আমাদের সমাজের, আমাদের ভন্ডামির। আমরা খুব ফলাও করে বলে থাকি, পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, এ আর এক মিথ্যে। এদের ধারণা পাপ একধরণের পাকা ফোড়া। টিপে পুঁজটা বার করে দিলেই নিরাময়। পাপ কোন মূর্ত জিনিস নয়। পাপীকে আশ্রয় করে পাপ তার সারা সত্ত্বায় সঞ্চারিত থাকে। পাম্প করে পাপ বার করে দেওয়া যায় না। তাহলে রাম, রাবণের পাপটা পাম্প করে ফেলে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। কৃষ্ণ কংস, জরাসন্ধ, বকাসুরদের হত্যা করে

চরম ব্যবস্থা না নিয়ে পাপমুক্ত করে জীবিত রাখতেন। আমরাও ফাঁসীর আসামীদের অপরাধটা বার করে দিয়ে ছেড়ে দিতে পারতাম। হয় না, তবু এই অর্থহীন কথাগুলো আমরা তোতাপাখীর মত বলি। মিথ্যে আর কল্পনার কিছু পেলেই আমরা নেচে উঠি। আমাদের জীবনবোধে,দর্শনে,ভাবনাচিন্তায় এই মিথ্যে কল্পনা আর নিটোল বাস্তবের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে নির্মাণ করেছে এক বিরাট কম্যুনিকেশন গ্যাপ। এই মিসিং লিঙ্ক বা শূন্যস্থানটাই আমাদের ভন্ডামি বা স্ববিরোধী চরিত্রের প্রজননক্ষেত্র। চোখ বুঝলে জ্যোর্তিময় বিন্দু ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর, চোখ খুলেই কর্দমাক্ত পরিবেশ নিরন্ন মানুষ। জীব মাত্রেই শিব, কিন্তু আপনার পাড়াটি কেমন? ওঃ বলবেন না, প্রত্যেকটা ছোটলোক, কি যন্ত্রণায় যে আছি? অধিকাংশ মানুষের এইরকমই প্রকাশভঙ্গী । জপে যে আমার কি আনন্দ হয়, অন্য একটা জগতে চলে যাই, কি মধুময় অনুভূতি। এইরকম স্বর্গীয় অনুভবের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করুন, এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর মিলবে ঃ আর বলবেন না একটু কোর্টে যাব, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে হাতখানেক জমি নিয়ে বছর দশেক ধরে একটা মামলা চলছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এবং সর্ব বস্তুতে ভেজাল চলে শুধু এই দেশে। আকাশের অনেক ওপরে স্বর্গ কিংবা তার কাছাকাছি আমাদের জন্য আছে একটা সব পেয়েছির দেশ। পৃথিবীটা আমাদের কাছে প্রবাস, তাই পরিবেশ পরিজন সম্পর্কে আমরা উদাসীন। এর ফলেই আমরা ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে উঠি। এই নীচতাকে চাপা দেবার জন্য ধর্মের আচ্ছাদন, তত্ত্বকথার আবরণ, ভক্তির সহস্র উপকরণ। যোগফল সেলফ কন্ট্রাডিকশন, সজ্ঞান ভন্ডামি। খাদ্য ওষুধে কারা ভেজাল দেয়? অফিসে আদালতে উৎকোচ ছাড়া একটি কাজও করতে চায় না এরা কারা? ওই নিত্যপূজা, জপ, কীর্তন আর ধর্মধ্বজীরাই। এরা রাজনৈতিক দলের লোক হলে সেই দলের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, দলকে নিজের কাজে লাগায়। অনেকে বলবেন এরা জপকীর্তন ঠিকমত করে না, ডাকার মত ডাকে না ভগবানকে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে ধর্মাচরণের নিজস্ব ক্ষমতা বা ক্রিয়া বলে কিছু নেই? ভক্তির সঙ্গে দুধ না খেলেও প্রতিক্রিয়া হয়। অনিচ্ছার সঙ্গে মদ খেলে

নেশা হয়। ঘৃণার সঙ্গে বিষ খেলেও মৃত্যু হয়। এগুলো খুবই স্থূল জিনিস। ধর্ম অনেক উচ্চমার্গের বস্তু। যা নাকি জগতকে ধারণ করে আছে। অর্থাৎ একটি মহাসত্য। সেই সত্যবস্তুর আচরণের কোন প্রতিক্রিয়া আচরণকারীর মধ্যে হচ্ছে না কেন ? তখন আন্তরিকতা, 'ডাকার মত ডাকা' এই নতুন ভণ্ডামির অবতারণা করতে হচ্ছে কেন? এখানেই ফাঁক ও ফাঁকি। আমাদের জীবনে জটিলতার উৎস। এই মিসিং লিঙ্কটাকে কল্পনা দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে জুড়ে দিতে হবে, দেশ ও সমাজের সঙ্গে। তাহলে আমাদের চরিত্রে এই অসঙ্গতিটা থাকবে না। নইলে মানুষের এক ক্যারিকেচার হয়েই আমাদের যুগের পর যুগ কেটে যাবে। বড় ব্যবসায়ীদের আমরা দুনম্বরী বলি। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতা থেকেই বলি। কিন্তু দেশের এক নম্বর সাধুদের অনেককেই তো দেখি, এই দুনম্বরী ব্যবসায়ীদের দ্বারে অপেক্ষা করতে। তাহলে সাধারণ মানুষ কোন্‌টাকে চরম সত্য বলে মনে করবে? কোন্‌টার অনুসন্ধান করবে? অর্থের না পরমার্থের! যুক্তিবাদী মানুষের মনে এইসব প্রশ্ন মাথা কুটে মরে। উত্তর পায় না। উত্তর না পেয়ে সে অর্থগৃধ্নু হয়, নাস্তিক হয়। অথবা প্রচলিত ভণ্ডামির কাছে আত্মসমর্পণ করে এক গোঁজা-মিলের জীবন কাটিয়ে যায়। এ প্রশ্নের সরলীকরণ হয়নি যে তা নয়। আমরা ভুলে গেছি সমুৎকর্ষ এবং নিঃশ্রেয়স দুটোই চাই। জাগতিক সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দুটোই দরকার। ব্রহ্মও সত্য, জগতও সত্য। অর্থও চাই, পরমার্থও চাই। আমাদের দেশের যা স্থিতি, তাতে আধ্যাত্মিকতা, ব্রহ্ম, পরমার্থ একটু কম হলেও চলবে। দেশ বাঁচবে, আমরাও বেঁচে যাব।

ইওরোপ আমেরিকাকে আমরা মেটিরিয়ালিষ্ট ইম্‌ম্র্যাল বলে ব্যঙ্গ করি। যেন আমরা কত নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী। তাদের টাকা পেলে আমরা অঞ্জলি বাড়িয়ে দেবো, সেদেশে চাকরী পেলে জীবনে দেশে ফিরব না। এটা আমাদের প্রকৃত অবস্থা। ইওরোপ, আমেরিকায় এত ঠাকুরদেবতা নেই, এত স্নবারী নেই, কোন বস্তুতে ভেজাল নেই। ভেজাল শব্দটা শুনলেই ওরা চমকে ওঠে। ওরা জগতকে প্রবাস বলে মনে করে না, তাই দেশটাকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলেছে। আমাদের কল্পনায় স্বর্গ, তাই বাস্তবে আমরা প্রায় নরকেই থাকি। মশা মাছি নোংরা দুর্গন্ধ অশুদ্ধ

জল দূষিত পরিবেশইতো আমাদের বেঁচে থাকার পরিমন্ডল। বাস্তবতা বর্জিত চিন্তার কারণেই আমাদের এই উৎকট বৈসাদৃশ্য। বিপুল অসঙ্গতি। অত্যন্ত ধার্মিক গোঁসাইবাড়ী যান। তিনি পুত্রের পিতা, আর আপনি যাবেন দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারূপে। আপ্যায়নে দেখবেন বিগলিত করুণা জাহ্নবি যমুনা। দেনা পাওনার পর্ব এলেই দেখবেন এইসব গোঁসাইদের ভেতর থেকে একটি নির্দয় কসাই বেরিয়ে আসছে। শুধু কি তাই! এদেশে একটি গুরু তার শিষ্যদের বলতে পারে না, আমার শিষ্য হলে পণ নেওয়া চলবে না। ভয়ে বলে না, বললে শুনবে না। রাজনৈতিক দলবদলের মত অন্য গুরুর কাছে পালিয়ে যাবে। আজকাল বহু গুরু নিজের দল বাড়াবার জন্য প্রকাশ্যেই বলেন, চিকিৎসায় কাজ না হলে আপনারা ডাক্তার বদল করেন না? এরাই এদেশে ধর্মবেত্তা পথপদর্শক। এইসব গেরুয়াধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কাছে যাবার সময় শুধু একটি যৌবনবতী মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কিছুদিন সাংখ্য পাতঞ্জল, এমায়া প্রপঞ্চময়, তারপর দেখা যাবে গেরুয়া ভেদ করে একটি ভেড়ুয়া বেরিয়ে আসছে। গোঁসাই কিম্বা গেরুয়াধারীদের মধ্যে ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে, কিন্তু আগেই বলেছি ব্যতিক্রম প্রমাণ করে নিয়মকেই। সারা যৌবন পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে তারপর বিবাহে লক্ষাধিক টাকা পণ নিয়ে শ্বশুরমশাইকে নিঃস্ব করে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত এদেশে প্রচুর। এইসব প্রগতিশীল যুবকদের জিজ্ঞাসা করুন, বাবাজীবন এটা কিরকম হ'ল? নির্বিকারচিত্তে এই প্রগতিশীলেরা জবাব দেবে, আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না, বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা ছাড়ল না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এইসব সুপুত্রেরা কোনদিন বাবার একটা কথাও শোনেনি, শুধু এই কথাটি ছাড়া।

এই আমাদের দেশ, দেশের মানুষ, আর তাদের স্বরূপ, যা দর্পণে এতক্ষণ দেখালাম। রোগ বিশ্লেষণ করতে করতে নিরাময়ের কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। তবু আরো কিছু বিশ্লেষণ দরকার। ভন্ডামি স্ববিরোধিতা আমাদের সত্ত্বায় মৌরসী পাট্টা কায়েম করতে পেরেছে কারণ আমরা আমাদের চরিত্রের মধ্যে ইন্টিগ্রিটি হারিয়েছি, আমাদের ব্যক্তিত্ব বিচূর্ণিত। ধর্ম রাজনীতি ব্যবসা সব পৃথক কম্পার্টমেন্টের যাত্রী মনে করছি। সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে এসবের যেন কোন সম্বন্ধ নেই।

এই খন্ড খন্ড ব্যক্তিত্বকে জোড়া দিতে হবে। ইন্টিগ্রেটেড্ পার্সোনালিটি চাই, চাই ইন্টিগ্রেটেড্ কারেক্টার। গোটামানুষ। একটা পূর্ণ মানুষের চরিত্রে তিনটি স্তর থাকে—ব্যক্তি চরিত্র, জাতীয় চরিত্র ও আধ্যাত্মিক চরিত্র। এ অনেকটা আমাদের শিক্ষাক্রম, কিম্বা গৃহনির্মাণের সঙ্গে তুলনীয়। ম্যাট্রিক পাশ, গ্রাজুয়েশান, এম-এ পাশ। বাড়ীর ক্ষেত্রে প্রথমে ভিত্তি, তারপর দেওয়াল, তারও পরে ছাদ। সর্বাগ্রে ব্যক্তি। তাই ব্যক্তি চরিত্রের ছোট ছোট সদগুণ শৈশবকালেই প্রবিষ্ট করানো দরকার। বড়দের সম্মান দেওয়া, নারীজাতিকে মাতৃজ্ঞানে দেখা, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করা, কথা দিয়ে কথা রাখা, মিথ্যা না বলা, নেশার বশীভূত না হওয়া, ছাত্র হলে অধ্যয়নকে তপস্যা মনে করা—এগুলো ব্যক্তি চরিত্রের উপাদান। এগুলো থাকলে নিজের আত্মমর্য্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ব্যক্তি চরিত্রের ভিত না থাকায় ভয় এবং প্রলোভনের সম্মুখীন হলেই আমাদের মেরুদন্ড বেঁকে যায়। এরপরের স্তর হ'ল জাতীয় চরিত্র। জাতীয় চরিত্র মানে তর্কাতীত দেশপ্রেম। এটা না থাকার ফলেই দেশে বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত। রাষ্ট্রঘাতী কাজ করেও কারো মনে হচ্ছে না এগুলো অপরাধ। জনপ্রতিনিধিরা বিক্রী হয় গরু ছাগলের মত। তাদের ঠেকাবার জন্য আইন পাশ করতে হয়। জাতীয়তাবোধ না থাকার ফলে অতীতেও আমরা কোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারিনি। শুধু তাই নয়, গরু যেমন গরুর মাংস নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় পরমানন্দে, আমরাই উৎসাহের সঙ্গে বিদেশী শাসনকে প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় চরিত্র নির্মাণের পর আধ্যাত্মিক চরিত্র। ভিত্তিহীন, দেওয়ালহীন বাড়ীর ছাদ শুধুমাত্র কল্পনাতেই থাকতে পারে, আধ্যাত্মিকতাটা তাই আমাদের দেশে কল্পনার জগতেই রয়ে গেল। ম্যাট্রিক পাশ বি-এ পাশ না করে যদি কেউ এম-এ পরীক্ষায় বসে, তার ফলাফল কি হতে পারে? যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে।

তবুও সারা পৃথিবীর তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের ব্যক্তিচরিত্র অনেক ভালো। জাতীয় চরিত্র একেবারে জিরো পয়েন্টে। দেশপ্রেম, জাতীয়চেতনা না থাকার ফলে আমাদের ব্যক্তিচরিত্র আধ্যাত্মিক চরিত্র অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামগ্রিক চরিত্রটাই খন্ডিত স্ববিরোধী ভন্ড এবং ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। দেহের আশ্রয়

ছাড়া যেমন আত্মার বিবর্তন হয় না, ঠিক তেমনি দেশ এবং সমাজ হচ্ছে আমাদের সকল যোগ্যতার প্রয়োগক্ষেত্র। এই সমাজ সেই মহামায়ার ছায়ামাত্র, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, স্বামীজির এইসব কথার মর্মার্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। জাতীয় চরিত্র থাকলে বুঝতে পারতাম। কল্পলোকের কোটি কোটি দেবদেবী নয়, মাটি পাথরের মূর্তি নয়, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেসব সচল ভগবান তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল, একাত্ম হতে পারাই ধর্মানুভূতির শেষ কথা। আমাদের মন্দিরে মন্দিরে পার্মানেন্ট দেবতারা হয় কাঠ, নয় পাথরের, নয় কোন ধাতুর। পাথর, কাঠ আর ধাতুর মূর্তি পূজো করতে করতে আমাদের হৃদয়গুলো ধাতু এবং পাথরের মত নির্মম, কাঠের মত নীরস হয়ে গেছে। নইলে আমাদের চোখে পড়ত প্রত্যেকটি মন্দিরের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে বসে থাকে কিছু সচল ভগবান। তারা রুগ্ন, ক্লিষ্ট, তাদের পোশাক ছিন্ন, মলিন তাদের দেহ। আমরা শুভদিনে শুভকাজে মূল্যবান পোশাক পড়ে সযত্নে এদের স্পর্শ বাঁচিয়ে পাথরের দেবদেবীদের দিয়ে আসি ভাল ভাল সন্দেশ, সেই সন্দেশ সামান্য প্রসাদ হয়ে বাকীটা আবার চলে যাবে মিষ্টির দোকানে। অন্য ভক্ত আবার সেটা কিনে আনবে। সন্দেশের রীলে রেস চলতেই থাকবে। ভিখারীগুলোকে ভক্তির পথে বাধা এবং উৎপাত মনে করেই আমরা চলে আসি। অন্য ধর্মের লোকেরা এসে এই ভিখারীগুলোকে বাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যাবে। রোগের চিকিৎসা করাবে, লেখাপড়া শেখাবে, বাঁচার ব্যবস্থা করে দেবে, তারপর একদিন তাদের বলবে হিন্দুমন্দির ধ্বংস কর, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত কর। এগুলো গল্প নয় ঘটনা, এ ঘটনা ঘটেছে নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং কাশ্মীরে। এদের পিছনে বিদেশী চক্রান্ত প্রোৎসাহন তো আছেই, কিন্তু আমাদের ধর্মচিন্তায় রাষ্ট্র, সমাজ, দেশ জাতি অনুপস্থিত এটাই সকল ব্যাধির উৎসমুখ। আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা— রাষ্ট্র, সমাজ। আমাদের সবকিছু পাবার এবং দেবার ক্ষেত্র এই সমাজ। আমরা তা মনে করি না, মনে করি সমাজটা হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন ফিল্ড। ব্যক্তিকে পুষ্ট করার ক্ষেত্র। আমি বাঁচলে সমাজ, এই বিকৃত চিন্তা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সমাজ থাকলে, রাষ্ট্র থাকলে তবে আমি মর্য্যাদা নিয়ে স্বাভিমান নিয়ে বাঁচব এই সত্য আমরা ভুলে গেছি। পাকিস্তান, বাংলাদেশে কত বিদ্বান, ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুসমাজ না থাকার ফলে তাদের অস্তিত্ব মর্য্যাদা দুইই বিপন্ন হয়েছে! রণদাপ্রসাদ সাহার মত ধনীমানী ও দানীব্যক্তি, সাধনা ঔষধালয়ের মালিক অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষের মত ধনাঢ্য ব্যক্তি, সি পি এম নেতা প্রশান্ত শূরের পিতা জমিদার রায়বাহাদুর নগেন্দ্রমোহন শূরের মত ব্যক্তি নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন সমাজ সংগঠিত না থাকার ফলে। একটি হিন্দু লাঞ্ছিত হলে সারা ভারতে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে এই ধারণা যেদিন আমরা পৃথিবীতে দিতে পারবো, সেদিন সারা পৃথিবীর সর্বত্রই হিন্দুরা নিরাপদ বোধ করবে। তার জন্য প্রতিটি হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে সমাজচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা যুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্র, ধর্ম, জাতির কি হ'ল তা আমার দেখার কি দরকার, তারজন্য অনেক লোক আছে। এই ভাবনাই হিন্দুকে অসহায় করে রেখেছে। পাশাপাশি বাস করে কোটি কোটি হিন্দু প্রত্যেকেই যেন একাকী নিঃসঙ্গ গাছের মত। কেউ কারো খবর নেয় না, সুখদুঃখের খোঁজ নেয় না, উদাসীন নির্বিকার। ছোট ছোট দলে আবদ্ধ হয় শুধু সেই সময় যখন নিজেদের মধ্যে কলহ বাধে। নিজের সমাজের মধ্যেই শত্রু আবিষ্কার করে তাদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়া এবং তা অতি উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করা আমাদের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত শত্রুর আক্রমণের সময় আমরা ছত্রভঙ্গ শান্তিপ্রিয় নিপাট ভাল মানুষ। গোটা সমাজ আমার, আমি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এ ধারণা আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত নেই। এই অসম্পূর্ণ চিন্তা আমাদের মনের গভীরে শিকড় মেলে আছে বহুদিন ধরে। তাই এদেশে সামূহিক জীবনবোধ নেই। অনেক মানুষ একসঙ্গে বেশী দিন কোন ভাল কাজে লেগে থাকতে পারে না। কয়েকজন যুবক একটা ক্লাব দীর্ঘদিন চালাতে পারে না। সম্ভ্রান্ত বিদ্বান মানুষেরা একটা রাজনৈতিক দল শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাতে পারেন না! ধর্মপ্রাণ মানুষেরা একটি ধর্মীয় সংগঠন শান্তিপূর্ণভাবে চালাতে পারেন না। কেন পারেন না, এ নিয়ে আমরা ভাবনাচিন্তাও করি না। ব্যক্তিচরিত্রের গুণগুলো অর্জিত হয়নি, জাতীয়চরিত্রের গুণ, অনেক মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলার যে অভ্যাস তাও

সংগৃহীত হয়নি। মানুষগুলোই যেখানে খন্ডিত অসম্পূর্ণ, সেখানে আমরা যা কিছু করতে যাব তা ভন্ডুল হবেই। তাই গান্ধীর স্বপ্নের রামরাজ্য পরিণত হয় বাঁদুরে রাজত্বে, শ্রেণীহীন সমাজকারিগররা বহু পরিশ্রমে বানিয়ে ফেলেন একটি হীনশ্রেণীর সমাজ। ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে তাঁরা মাঠে নেমেছিলেন, এখন বস্তুটাকে বাদ দিয়ে দলটাকেই মূল করে নিয়েছেন। কারণ সমাজবাদের শ্লোগানের আড়ালে আমরা মন থেকে সমাজকে অনেকদিন বাদ দিয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় চরিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা না থাকলে এই হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে যে ব্যক্তির প্রাণের সংযোগ থাকেনা তার জীবন স্রোতহীন পুকুরের মতো পঙ্কিল হয়ে উঠবেই। তিনি বিদ্বান, পন্ডিত, সাধক, তপস্বী, লেখক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক যা হন, তাঁর জীবনকে শ্যাওলা, পানা, গুগলী, শামুকের মত নানান কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ চিন্তা গ্রাস করবেই। তার ওপর আমরা দীর্ঘদিন পরাধীন ছিলাম, দাস ছিলাম। দাসেদের স্বভাবই হচ্ছে পরস্পরে কলহ করা সন্দেহ করা। পরস্পরকে কেবলই ছোট করা অপমান করা। আমরা তাই করছি। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ ভোলার চেষ্টা করলেও বাঙাল, ঘটি, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, অসমীয়া, বাঙালী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত কোন না কোন ভাবে অন্যকে ছোট করতে চাই, অপমান করতে চাই।

এই দাস্যভাবকে অতিক্রম করতে গেলে সারাদেশে একটা বিজিগীষু মনোভাব নির্মাণ করা দরকার। সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের ধর্মসংস্কৃতির প্রসার ঘটানো দরকার। একসময় সারা পৃথিবীতে আমরা সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব করতাম। তাই আবার প্রভুত্ব করবো এটা কোন নতুন কথা নয়। বিবেকানন্দের ভাষায় আমাদের এ্যাগ্রেসিভ হতে হবে। শুধু আত্মরক্ষার কথা বলে যেসব জাতি তারা এই সংঘর্ষময় পৃথিবীতে বেশীদিন টিকতে পারে না। খেলতে গেলেও ডিফেনসিভ এবং অফেনসিভ দুটো দিক থাকে। মিলিটারী ষ্ট্রাটেজীতেও বলা হয় "অফেন্টসস ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স।" আক্রমণই প্রতিরক্ষার উত্তম উপায়। ভারতের উচিত ছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির পরই তাকে জীর্ণ দুর্বল করার, নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা। যে কাজ পাকিস্তান ভারতের ক্ষেত্রে করে চলেছে। বাংলাদেশ উদ্ধার করার পর তা ভারতের

নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত ছিল। তাতে ওদেরও লাভ হ'ত, মুজিব মরতো না। গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আজ বাংলাদেশকে এত মূল্য দিতে হ'ত না। সাহায্য করার শর্ত হিসাবে ভারত কমপক্ষে সীমান্তের কয়েকটি জেলা নিয়ে নিতে পারতো। বাংলাদেশের হিন্দুরা নিরাপদে সেখানে বাস করতে পারতো। আক্রমণ ক্ষমতার প্রকাশ না ঘটানোর ফলে চট্টগ্রামে চাকমা হিন্দুরা নিহত হয়। পালিয়ে আসে ভারতে হাজারে হাজারে! ভারত ফরাক্কার মুখ ঘুরিয়ে তিনদিনে বাংলাদেশকে মরুভূমি করে দিতে পারে এই আন্দাজ দিলেই ব্যবহার পাল্টে যেত। বাংলাদেশ সরকার সংযত হ'ত। বর্তমান পৃথিবীর ভাষা ভারতকে আয়ত্ত করতে হবে। ভারতের মূল সমাজ হিন্দু সমাজকে আজকের পৃথিবীতে মর্য্যাদার সঙ্গে বাস করতে গেলে ঔদার্য্য, সাহিষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ এবং আগ্রাসনে অভ্যস্ত হতে হবে! নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং অন্যের কল্যাণের জন্যই আজ হিন্দুসমাজের মারমুখী হওয়া দরকার। অসম্পূর্ণ অসহিষ্ণু ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতবাদগুলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে এই আগ্রাসন এবং আক্রমণকে ভিত্তি করেই। এদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ঔদার্য্য সহিষ্ণুতা ক্ষমা এবং শুধুমাত্র আত্মরক্ষার ভাবনা আমাদের দেশকে ছিন্নভিন্ন করছে, আর গোটা জাতির মধ্যে একটা ভীত অসহায় পরাজিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি করছে।

আত্মরক্ষা নয় আত্মপ্রসার ঘটাতে হবে। আত্মপ্রসার ঘটাতে গেলে চিন্তাভাবনায়, দৈনন্দিন জীবনচর্য্যায় এমনকি খাদ্যভ্যাসেও পরিবর্তন আনতে হবে। শরীর এবং মনের গঠনে খাদ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে আমরা যখন শৌর্য্যে বীর্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, দর্শনে জগতে শ্রেষ্ঠ ছিলাম তখন এই দেশ নিরামিষভোজী ছিল না। আর্য্য মুনিঋষিরা সকলেই মাংসাহার করতেন। রাম এবং কৃষ্ণের প্রিয় খাদ্য ছিল অ্যানিম্যাল প্রোটিন। তাই এঁদের দর্শন এত উচ্চ এবং এঁরা বীরভাবে উদ্দীপ্ত ছিলেন। আক্রমণের প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল। নিরামিষভোজীরা ভীতু, পলায়নপর, মর্য্যাদাশূন্য, আক্রমণ ক্ষমতাহীন হবেই। অপমানকেই তারা সম্মান মনে করবে। আমাদেরকে এইরকম বীর্যহীন তেজশূন্য জাতিতে পরিণত করার জন্য এদেশে গভীর চক্রান্ত হয়েছে। যা করলে, যা খেলে একটা জাতি বলিষ্ঠ

প্রাণবন্ত শক্তিশালী হয়, ধর্ম আর শাস্ত্রের নামে সেখানেই বাধা আরোপ করা হয়েছে। বিবেকানন্দ এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে অ্যানিমাল প্রোটিন খাবার পক্ষে বলে গেছেন। গীতায় সাত্ত্বিক আহারের বিবরণ মাংসেরই অনুকূলে। জানি প্রচলিত ধারণায় আঘাত লাগছে। প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা শরীরে বিষফোঁড়ার মত। ক্ষতিকর, ফাটিয়ে দেওয়া উচিত বুঝি। তবু কাছে হাত নিয়ে যেতেও ভয় হয়। আমরা কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আজও পৃথিবীতে সর্বদিক থেকে প্রভুত্ব করছে মাংসাহারী মানুষেরাই। পশু জগতেও তাই। বিশালদেহী হাতি মহাশক্তির অধিকারী, কিন্তু বাঘের মত তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ক্ষিপ্রতা এবং আক্রমণক্ষমতা নেই। এরা আক্রান্তই হয় বারবার। একথা ঠিক নিরামিষভোজীদের কষ্ট সহ্য করার, অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা থাকে অদ্ভুত। মাংসাশীদের তা থাকে না। দশমণ মালসহ একটি গাড়িতে যদি দুটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও জুড়ে দেওয়া হয়, কয়েক পা গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দুটি রুগ্ন গরু পঞ্চাশ মণ মাল নিয়ে দিনরাত টেনে পৌঁছে দেবে ষাট মাইল পথ। অবশ্য ওদের অন্য কোন উপায়ও নেই। এটা যদি জীবনীশক্তি হয় তাহলে স্বীকার করতে হয় আমরা শক্তিমান। নইলে শক হুন পাঠান মোগলদের এত অত্যাচার আমরা সইলাম কেমন করে?

এখনও সেই দাসেরই মনোভাব। এমন একটি দিন নেই যেদিন স্বদেশে অথবা বিদেশে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে অকারণে অন্যধর্মের লোকের হাতে হিন্দু মরে না, লাঞ্ছিত বিতাড়িত হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া? কিছুই হয় না। এর অন্যতম কারণ— খাদ্যভ্যাস। আত্মপ্রসার ঘটাতে, শত্রুর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে নিজেদের শক্তিমানরূপে গড়ে তুলতেই হবে। আমরা এ্যাভারেজ কাওয়ার্ড—এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনচর্যায় এবং খাদ্যে পরিবর্তন আনতেই হবে আজকের সমস্যাগুলোকে উৎপাটনের জন্য। শক্তি প্রয়োগে তখন আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত হতে হবে না, কারণ রাষ্ট্ররক্ষায় বলপ্রয়োগ, শক্তির প্রকাশ কোন নতুন জিনিস নয়। স্বাধীনতার পর ছোট ছোট রাজ্যগুলো এবং গোয়া বলপ্রয়োগেই ভারতে যুক্ত হয়েছে। আজকে বিচ্ছিন্নতা রুখতে গেলে

খালিস্থানের উৎসমুখে আঘাত হানতে হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা এবং গোর্খাল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে খৃষ্টান মিশনারীদের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে হবে। ভারতের শক্তি আছে, আক্রমণ করতে পারে, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে, এই ধারণা জগতকে দিতে হবে। কনসেশন দিয়ে তোষণ দিয়ে শান্তি আসে না। পাকিস্তান দিয়ে আসেনি। পাঞ্জাব চুক্তি, লালডেঙ্গার সঙ্গে আপোষ করে বাকীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এটাই হয়। আক্রমণক্ষমতাশূন্য নিরীহ গোবেচারী ভাবটাই শক্তিমানকে নির্যাতনে উৎসাহিত করে। প্রাণী হিসাবে কচ্ছপের অপেক্ষা নিরীহ এবং শরীরে এতো ভালো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অন্য কারো নেই। শুধুমাত্র আক্রমণের ক্ষমতা না থাকার ফলে তার কি পরিণতি হয়, মানুষ তাকে চিৎ করে ফেলে জীবন্ত অবস্থায় তার শরীর থেকে মাংস কেটে কেটে নেয় আর কচ্ছপটা মাঝে মাঝে মাথাটা বার করে জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে। ঠিক যেমন আমরা পাকিস্তান, খালিস্থান, ঝাড়খন্ড, নাগাল্যান্ড, কাশ্মীর, বেরুবাড়ী তুকের গ্রাম দহগ্রাম তিনবিঘাকে দেখছি, ত্রিপুরার চন্দননগরকে দেখছি। দর্শক হয়ে থাকলে বেশীদিন আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না।

তাই আমাদের চরিত্রে চাই প্রচন্ড আক্রমণ ক্ষমতা। চাই বিস্তার। এতে স্লেভ্ মেন্টালিটি ডিফিটিষ্ট মেন্টালিটির জড়তা কেটে যাবে, অনেকদিন ধরে অনেকবার আমরা হেরেছি। বিজ্ঞানের সত্য হচ্ছে প্রতিটি ক্রিয়ার সমতুল বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তাহলে এবার আমাদের জেতার পালা, এগোবার পালা। সে লক্ষণ ক্রমশঃই ফুটে উঠছে। রামের জন্মভূমি, কৃষ্ণের জন্মভূমি, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির উদ্ধারের চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু এগিয়ে যাচ্ছে। রামের জন্মভূমি উদ্ধার সম্ভব হয়েছে, কৃষ্ণের জন্মভূমি উদ্ধারের আয়োজন চলছে। ইসলাম এবং খৃষ্ট মতবাদ যে এদেশের পক্ষে একটা দারুণ বিপদ একথা এখন জোরগলায় মানুষ বলছে, লিখছে। যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এখনো হিন্দুজাতির মধ্যে যে দ্বিধা জড়তা, সত্যকে স্বীকার করতে সঙ্কোচ অনৈক্য নৈরাশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দুত্বের সম্প্রসারণ ঘটলেই এগুলো কেটে যাবে। হারলে মানুষ ঝগড়া করে, জিতলে ঝগড়া থাকে না। পাড়ায় তাস খেলা দেখলেই আমরা এটা বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষের অস্তিত্বের ওপর, হিন্দুজাতির অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল আমাদের সব ভদ্র আদর্শ এবং কল্পনার সকল দেবতা। তাই দেশচেতনাকে ভগবৎচেতনার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। দেশনিরপেক্ষ ধর্ম, ভক্তি, ঈশ্বরচর্চা কি ধরণের মানুষ তৈরী করে, সারাদেশেই তার প্রমাণ ছড়ানো। একটু ঝুঁকি আছে এমন ঘটনা ঘটলেই আমাদের সততার, বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ভীতু হবেই। দেশকে যে সর্বস্ব মনে করে, অনেকের মধ্যে যে বাঁচতে চায়, তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণ ঘটে। অজানিত ভয়ে তটস্থ থাকা এবং নিত্য গীতাপাঠ করা লোক তো আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই। অথচ এই গীতাপাঠের সঙ্গে দেশ যুক্ত হতেই এদেশের তরুণ কিশোর বিপ্লবীদের কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হয়ে গেল। এক হাতে গীতা অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে যে যুবকেরা এগিয়ে গিয়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে, ফাঁসীর আগে তাদের ওজন বেড়ে গেছে, হাসিমুখে তারা ফাঁসীর দড়ি গলায় পড়েছে। দেশকে মা বলে মনে করলে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় অমানুষিক শক্তি স্বর্গীয় প্রেরণা। তার চিন্তাভাবনা স্রোতস্বী হয় বিস্তৃত হয়, সে অ্যাকটিভ হয়, আনন্দময় হয়। সে নিজের দুঃখের কথা বলে অন্যকে ভারাক্রান্ত করে না। নিজের জীবনকে বোঝা বলে মনে হয় না তার। যে লেখক তাঁর সাহিত্যে দেশকে স্পর্শ করেছেন তিনি কালজয়ী হয়েছেন। না হলেই যৌন মনস্তত্ত্বের পাঁক ঘেঁটে টাইম সার্ভার হয়ে হারিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষকে জননী মনে করলে আমরা কোন যুক্তিতেই দেশকে খণ্ডিত করতে পারতাম না। দেশকে মা ভাবলে দেশের মানুষকে ভাই ভাবলে সে আর খাদ্যে ওষুধে ভেজাল দিতে পারবে না! অফিসে ফাঁকি দিতে ঘুষ নিতে তার বিবেকে বাধবে। যে উন্নত দেশগুলোয় ভেজাল নেই, দুর্নীতি নেই, সেদেশে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম অত্যন্ত তীব্র। এদেশে বহু মানুষের অভ্যাস সবরকম দুর্নীতি অন্যায়ের জন্য সরকার কোন নেতা অথবা রাজনৈতিক দলকে দায়ী করা। তারা ভুলে যায় একটি দেশের জনগণ হচ্ছে জলের মত, জল দূষিত থাকলে সেখানে ভাল জাতের মাছ টিকতে পারে না। রুই কাতলা মিরগেল ফেললে দুদিনে মরে ফুলে ভেসে উঠবে। লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াবে শোল বোয়াল চিতলের দল। আমাদের দেশে তাই হচ্ছে। জল দূষিত জনগণ নিম্নমানের, এই নির্মম সত্য আমরা মানতে

রাজী নই। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা সাধুসন্ত, নেতা, পন্ডিত, লেখক ব্যবসায়ী পেয়েছি। যিনি এই অবস্থার পরিবর্তন চাইবেন তাঁর নিজের মধ্যে আগে পরিবর্তন আনতে হবে।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত থাকে। তিনি ভাল হলে তাঁর বৃত্তটা শুদ্ধ হবে। ধীরে ধীরে শুদ্ধ হবে, ভালো হবে গোটা দেশ। এরসঙ্গে চাই দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার। শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে চাই তর্কাতীত দেশপ্রেম। শিক্ষিত মানুষেরা সবচেয়ে সুযোগসন্ধানী এবং সুবিধেবাদীরূপে চিহ্নিত হচ্ছেন আমাদের সমাজে। ভেজাল দুর্নীতি কিংবা চরচক্রে মাঝে মাঝে যারা ধরা পড়ে তারা কেউই সমাজের নীচুস্তরের মানুষ নয়। দরিদ্র অশিক্ষিত নয়। শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই এ কাজে লিপ্ত, কারণ দেশপ্রেমহীনতা। একটা দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম না থাকলে সর্বত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়। যা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। শিরে সর্পাঘাত হলে যেমন তাগা বাঁধার কোন জায়গা থাকে না, তেমনি দেশপ্রেমশূন্য জাতির কোন সমস্যার সমাধান হয় না। তাদের রাজনীতি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক খুব বেশী হলে দলকেন্দ্রিক, যাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ বলে কিছু থাকে না।

অতীতে আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে মহাত্মা গান্ধী অগণতান্ত্রিকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করলেন। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে বিদেশে সেনা সংগঠিত করে ভারতের দিকে অভিযান করলেন। নেহেরু বললেন ঃ আমি খোলা তলোয়ার দিয়ে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাবো। কম্যুনিস্ট পার্টি বলল, সুভাষ তোজোর কুকুর, জাপানের দালাল। আমরা এই দুটি দলকেই আমাদের কল্যাণকারী মনে করে গ্রহণ করলাম। কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত ভাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গটা দিতে চেয়েছে পাকিস্তানকে। শ্যামাপ্রসাদ বহু চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাবকে ভারতে রেখে দিলেন। কংগ্রেস কম্যুনিষ্টদের আমরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনে করি। আর শ্যামাপ্রসাদ এবং তার দলকে মনে করি সাম্প্রদায়িক। আমাদের বিচারবুদ্ধি এবং দেশপ্রেমের এই হচ্ছে মানদন্ড।

দেশকে যারা পরাধীন করে রাখলো দীর্ঘদিন, যাদের সঙ্গে লড়াই করে অর্জিত হ'ল স্বাধীনতা, তাদেরই একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান করার কথা পৃথিবীতে কোন দেশ ভাবতে পারে? পারে না। পারে শুধু ভারতবর্ষ। তাই স্বাধীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। এটা সম্মানের না অপমানের বোঝার ক্ষমতা থাকে না দেশপ্রেমশূন্য মানুষের দেশে। আত্মপ্রবঞ্চনায় অভ্যস্ত দেশ এটাকেই স্বাধীনতা মনে করে ফাঁকা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

শুধু নিকট অতীতে নয়, বর্তমানেও একই ধরণের আত্মঘাতী লাইনে চলছে এই দেশ। এই দেশটা যে মূলতঃ হিন্দুদের দেশ এই সত্যটাকে স্বীকার করতে বহু মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত। সংখ্যালঘুরাই যেন সব। তাদের কল্যাণের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা নামে একটা ইউটোপিয়ান আইডিয়ার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হবে হিন্দুসমাজকে। হিন্দু স্বার্থের কথা বলা মানেই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা এক ভীষণ অন্যায়। এইরকম একটা বাতাবরণ তৈরী হয়েছে এই দেশে। দেশপ্রেম না থাকায় বুদ্ধি ফ্রিজড্ হয়ে গেছে বলে, বুদ্ধির জগতে অসংলগ্নতা স্থায়ী হয়ে গেছে বলে। নইলে একনায়ক সাম্রাজ্যবাদী সাম্প্রদায়িক ইরাকের প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করার জন্য মুক্তকচ্ছ হয় ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল। সহকর্মীদের পরামর্শ শুনতে রাজী নয় সাদ্দাম। তাদেরকে হত্যা করে। হাজার হাজার কম্যুনিষ্টের হত্যাকারী। রাতারাতি কুয়েত দখল করে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। সাম্প্রদায়িক লাভ তোলবার জন্য পতাকায় লিখে দিল 'আল্লা হো আকবর'! যার বিরুদ্ধে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইলো। সারা পৃথিবীর আবেদন অনুরোধ উপেক্ষা করল সাদ্দাম। সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রগুলো চাইলো ইসলাম দুনিয়ার নয়া হিটলার সাদ্দাম হোসেনকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হোক। রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করল না, চীন নির্বাক রইল। গগন বিদীর্ণ হ'ল শুধু ভারতে। সবচেয়ে বেশী চীৎকার করল কম্যুনিষ্ট পার্টি। সাদ্দামের মহিমা কীর্তনে মুখর হয়ে উঠল তারা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে তারা চীন, রাশিয়া, আরব রাষ্ট্রগুলোকে দেখতে পেলো না। দেখলো শুধু আমেরিকাকে। দেওয়ালে লিখল ঃ মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ ইরাক থেকে হাত ওঠাও। ইরাকি মায়ের সন্তানহারা ছবি দেখিয়ে সহানুভূতি সংগ্রহ করতে গেল ইরাকের জন্য। ঠিক সেইসময় তিন লক্ষ হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেছে মুসলমানেরা। সন্তানহারা কুয়েতি মা আর সন্তানহারা কাশ্মীরী মায়ের দুঃখ বোধহয় ইরাকি মায়ের চেয়ে কম। এই দেউলিয়া বুদ্ধিকে সমর্থন করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সর্বনাশের বীজ। বুদ্ধি দিয়ে আমরা বিচার করে দেখি না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলে আদৌ কিছু আছে না মার্ক্সবাদী স্বর্গের মতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটি কল্পিত দৈত্য! আসল সত্য হচ্ছে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করার অগ্রিম ষড়যন্ত্র। আমেরিকা কখনও কারো একইঞ্চি ভূমি দখল করেনি। ভিয়েতনামে তাকে ডেকে এনেছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার। যেমন আফগানিস্থানে এসেছিল রাশিয়া। রাশিয়া আজ দুর্বল দেশ। তথাপি সে এখনও লাটাভিয়া, বাটাভিয়া, মোলদাভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ছাড়তে চাইছে না। কম্যুনিষ্ট প্রচারের এমনই মহিমা যে সত্যকথা বলতে আমাদের জিভ জড়িয়ে যায়।

আমেরিকা নিজে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়ে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্টের প্রতিষ্ঠা করে। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ করে। শ্রমিক আন্দোলন করে মে দিবসের গৌরব প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকার পাঠানো গমের রুটি খেয়ে ভারতের কমিউনিষ্টরা মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে ইঁট মেরে আসত। এখন ভারত থেকে আমেরিকা থেকে গম গেলে তবে রাশিয়ার লোকেরা দুটো রুটি খেতে পায়। প্রচার দিয়ে স্বর্গ বানানো হয়েছিল। এখন স্বর্গের পর্দা সরে গেছে। মর্গ দেখা যাচ্ছে। সারি সারি লাশ দুঃখের দারিদ্র্যের বেকারীর আর হতাশার। আমেরিকা পকেটের টাকা খরচ করে দুনিয়ার লোককে সাবধান করেছিল, মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একথা শুনলে কম্যুনিষ্ট দেশগুলো আজ ভিখারিতে পরিণত হ'ত না। মার্ক্সবাদের আর একটি বিকৃতি তারা নিজ দেশের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শুধু প্রতিবেশীকে আক্রমণ করতে ওস্তাদ। উত্তর ভিয়েতনাম কম্যুনিষ্ট। তারা বারবার আক্রমণ করেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে! এখন কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে উত্তর ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওপর

নির্ভরশীল। উত্তর কোরিয়া কম্যুনিষ্ট। দুর্ভিক্ষ বেকারী নিত্যসঙ্গী। তবু বারবার আক্রমণ করেছে দক্ষিণ কোরিয়াকে। এখন প্রাণের দায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে এক হতে চলেছে। দুই জার্মানী এক হয়ে গেল। পশ্চিম জার্মানী বলছে বোঝা বেড়ে গেল। মানে লায়াবিলিটিস্। উত্তর ইয়েমেন কমিউনিষ্ট, মানে ভিক্ষুক। একাধিক আক্রমণ করেছে দক্ষিণ ইয়েমেনে। আজ দক্ষিণ ইয়েমেনের দাক্ষিণ্যে উত্তর ইয়েমেন অস্তিত্ব রক্ষা করছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসস্বচ্ছ দর্পণে দেখা যাচ্ছে কমিউনিজম কোন কল্যাণ করতে পারে না। কল্যাণকারীকেই আক্রমণ করে। আনন্দের কথা শেষ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তার আগে অনেক ক্ষতি করে দিয়ে যায়। সারা বিশ্বের কমিউনিষ্ট দেশগুলি আজ একথাই বলছে। দেশপ্রেমের অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর জড়তার কারণে এ সত্য এখানে এখনও অনেকের উপলব্ধিতে আসেনি। তাই সারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন মার্ক্সবাদের বীজতলা আজ পশ্চিমবঙ্গ। কোথায় কোন কল্পলোকে এর চারা রোপিত হবে নিজেরাও জানেনা! জানেনা কোনও যুক্তিতেই সাদ্দামের মতো একটা ব্রুট ডিক্টেটরকে সমর্থন করা উচিত নয়। ভারতের মার্ক্সবাদীরা তাই করেছে। করেছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও। এইসব দলে সবাই নির্বোধ, অশিক্ষিত, স্বার্থপর একথা বলা যায় না। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিও আছেন। এঁদের মধ্যে তীব্র দেশপ্রেম নেই। এঁরা ভাবছেন এতেই আমাদের আপাততঃ রাজনৈতিক লাভ হবে। সাদ্দামকে সমর্থন করলে মৌলবাদী মুসলীম ভোট পেতে সুবিধে হবে। সামান্য তাৎকালিক সুবিধে পেতে গিয়ে গোটা দেশ কোন গাড্ডায় পৌঁছে যাচ্ছে এটা আমরা দেখছি না। গোটা জাতির সঙ্গে কিরকম অসুবিধে এবং দুর্গতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সামান্য দেশপ্রেম অবশিষ্ট থাকলে অবশ্যই বুঝতে পারতাম। স্বার্থমগ্ন ব্যক্তি পৃথিবীর আনন্দও উপলব্ধি করতে পারে না। পারে না দূরদর্শী হয়ে বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের স্বার্থকে নিরাপদ করতে। তীব্র জাতীয়তাবোধ প্রগাঢ় দেশপ্রেম ব্যতীত একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, অগ্রগমন অসম্ভব। অন্যান্য সহস্র গুণাবলী নিয়েও সে হারিয়ে যাবে এবং তার অধঃপতন অনিবার্য্য।

অতীতের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে অধিকাংশ ব্যক্তির চরিত্র স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক মূল্যবোধ আজ কোন্ স্তরে? বাস্তবতার দূরবীণে চোখ রাখলে দেখা যাবে, গভীর অন্ধকার সর্বস্তরে বিপর্যস্ত বেপথুমান মৃত্যুমুখী একটা সমাজ। সাফল্যের কথা যারা শুনিয়ে চলেছে তারা আত্মপ্রবঞ্চক এবং দক্ষ শব্দ ব্যবসায়ীমাত্র। আত্মপ্রবঞ্চকদের আত্মমর্য্যাদাবোধ পর্যন্ত থাকে না। আত্মহননকে মনে করে আত্মরক্ষা। তামিল উগ্রপন্থীদের সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করে তারপর সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদের হত্যাকে এদেশে বলা হ'ল রাজনীতি। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য দিয়ে ভারতকে বিপাকে ফেলতে চায় পাকিস্তান। ভারত নতজানু হয়ে শুধু তাদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে। বাংলাদেশ হাজার হাজার মন্দির ভাঙে, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী পাঠায়, সীমান্তে হিন্দুবাড়ীতে ডাকাতি করে, প্রকৃতির অভিশাপ নেমে এলে ভারত সাহায্য পাঠায়, বাংলাদেশ বারবার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আমরা এতে অপমানবোধ করি না। অযোধ্যায় শতশত হিন্দুহত্যায় যারা সমর্থন যোগায় রাজীবের মৃত্যুতে তারা মাত্রাতিরিক্ত শোক প্রকট করে। দুটোই দুঃখজনক শোকাবহ ঘটনা মনে হয় না! দেশপ্রেমশূন্য মানুষেরাই এইরকম জটিল হয়, তাদের বেদনাবোধ দেশকেন্দ্রিক নয়। আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় নিজের এবং দলের স্বার্থে। এইরকম মানুষেরা ব্যক্তিস্বার্থের বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়ে নিজেকে এবং জাতিকেই বিপন্ন করে তোলে। প্রগাঢ় দেশপ্রেম মনের মধ্যে উপস্থিত হলে আমাদের এই সুবিধেবাদী চরিত্রের পরিবর্তন ঘটবে। তখন আমরা বুঝতে পারবো দেশকে ভালোবাসলে বেশী সুবিধে পাওয়া যায়। আমি কোথাও ঠকবো এই উৎকণ্ঠা থাকবে না, কোন জিনিষ কিনে উদ্বেগ থাকবে না দোকানদার দুনম্বর জিনিস দিল কিংবা ওজনে কম দিল কিনা। ইহুদীরা উনিশশো বছর ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সারা পৃথিবী। স্বাধীন জন্মভূমি ইস্রায়েল পেয়েছে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে। কিছুই ছিল না সেখানে। জনসংখ্যা মাত্র ত্রিশলক্ষ। চারদিকে কুড়ি কোটি যুদ্ধবাজ মুসলমান। বারবার তারা ইস্রায়েলকে আক্রমণ করে নিজেরাই পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হয়েছে। দেশপ্রেমেই এই অজেয় শক্তির

উৎস। ত্রিশলক্ষ ইহুদি ঐক্যবদ্ধ এক প্রাণ। তারা শক্তির চর্চা করে। ভক্তি বলতে বোঝে দেশভক্তি। আমাদের মতো ব্যক্তিগত পারিবারিক, সার্বজনীন, টেম্পোরারী, পার্মানেন্ট দেবতাদের নিয়ে ভক্তির মাতামাতি করলে এতদিন তারা দেশ, ধর্ম, অস্তিত্ব সব হারাতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুটি দেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল—জাপান এবং জার্মানী। নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া আজও হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রবল দেশপ্রেম প্রচন্ড কর্মোন্মদনা দিয়ে সব ক্ষতচিহ্ন তারা মুছে দিয়েছে। আমাদের আর্থিক সাহায্য দেয় জাপান। চীন রাশিয়াকে কারিগরী সাহায্য দেয়। জাপানের শিল্পের অগ্রগতি আমেরিকাকে আতঙ্কিত করে দিয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজো না করে তারা বিজ্ঞানচর্চা করছে। লক্ষ্মীপুজো না করে ওরা নিষ্ঠা দেখিয়েছে কৃষি বিজ্ঞানে। পরস্পরকে জড়িয়ে আছে সারা দেশ এবং দেশের মানুষের সঙ্গে। তাই দেশও উন্নত, মানুষগুলিও উন্নত। জার্মানী চূর্ণ করা হয়েছিল, দু টুকরো করা হয়েছিল। বার্লিনে জল ঢুকিয়ে চুবিয়ে মারার বন্দোবস্ত হয়েছিল জার্মানদের। সব ঘা তারা শুকিয়ে ফেলেছে। খন্ডিত পশ্চিম জার্মানী আজ একটা উন্নত দেশ, আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেশ। কোন যাদু কিম্বা দেবতার আশীর্বাদে নয়, দেশভক্তি আর কর্মশক্তিই এই অগ্রগমনের কারণ।

দেশপ্রেম মানুষকে অমানুষিক পরিশ্রমের প্রেরণা দেয়। মৃত্যুভয় জয়ের সাহস দেয়। আমাদের এই অলস ভীরু কপট ভক্তের দেশে দেখা গেছে, যারা ভারতমাতাকে আরাধ্যা মনে ক'রে দেশপ্রেমকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি ভেবেছেন তাদের মধ্যে এক মহাশক্তির জাগরণ ঘটেছে। এদের গীতাপাঠ সফল সার্থক হয়েছে। মজঃফরপুরের বৃদ্ধ উকিল যখন ক্ষুদিরামকে বললেন, তুমি একটা সই করে দাও ক্ষুদিরাম, তোমার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ নেই। আমি হাইকোর্টে আপীল করি! কিশোর ক্ষুদিরাম মরণজয়ী হাসি হেসে বলেছিল, "স্যার আমি গীতা পড়েছি। আমি জানি আমাকে ফাঁসী দেওয়া যায় না, অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না। চন্দনচর্চিত মাল্যভূষিত হয়ে নিরাপদ জায়গায় বসে সাধুগুরুদের গীতার ব্যাখ্যা নয়, ফাঁসীর আদেশ হয়ে যাওয়া এক কিশোরের অকম্পিত উক্তি। এই দেশেরই ছেলে ভগত সিং ফাঁসীর মঞ্চে যাবার আগে

জেলখানায় দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন "হর দীওয়ার পে হাম হসরত কো নজর করতে হ্যাঁয়, খুশ রহো অহলে বতন হামতো সফর করতে হ্যাঁয়"—এর মানে দরজায় এবং দেওয়ালে সর্বত্র আমি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি, হে আমার দেশবাসী তোমরা খুশী থেকো, আমরা তো এইভাবেই বারবার আসি আর যাই। সততা, সারল্য, তেজ, মৃত্যুভয় জয়, বড় কারণে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন, যেগুলো সত্যিকারের ধর্মের লক্ষণ তা এদের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল, কারণ দেশভক্তি। দেশভক্তিতে আসে দেশের মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা। নিজের জীবন মৃত্যুর প্রতি আসে নিরাসক্তি। দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ এবং লালন পালনের জন্য আমরা সারাজীবন মাকে দেবী বলে মনে করি। মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে সদা সচেতন থাকি। যে থাকে না তাকে আমরা জননীর গর্ভের লজ্জা বলে মনে করি, কুলাঙ্গার মনে করি। আর যে দেশমাতৃকা আমাকে সব কিছু দিল, আলো, হাওয়া, অন্ন, জল, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি সব। যার কোলে জন্ম নিলাম যার বুকে মাথা রেখে মরবো, তাকে জীবনসর্বস্ব মনে করতে পারবো না কেন? পারিনি, তাই তো আমরা বেশীরভাগ মানুষ ভারতমাতার গর্ভের লজ্জারূপে পরিগণিত হয়েছি। আমাদের সব তত্ত্বজ্ঞানে, উচ্চ চিন্তা বিপথগামী হয়ে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে এই একটিমাত্র কারণে! সবচেয়ে নোংরা হোটেলটিরও নাম যেমন আদর্শ হিন্দু হোটেল, আদর্শ শব্দটা শুধু সাইনবোর্ডে, আমাদের জীবনও এখন ঠিক তাই। হতাশার কিছু নেই, ভুল করা এবং ভুল সংশোধন করা মানুষেরই ইতিহাস। যে মাটিতে মানুষ আছাড় খায় সেই মাটি ধরেই মানুষ উঠে দাঁড়ায়। এই লজ্জা, এই গ্লানি আমরা অচিরে ধুয়ে ফেলবো। নানান যোগ্যতা প্রাণপ্রাচুর্য্য এবং সদ্‌গুণে সজ্জিত করে যেদিন আমরা নিজেদের ভারতমাতার চরণে নিবেদিত করে মনে মনে বলতে পারবো—রাষ্ট্রায় স্বাহা! আমার যা কিছু আছে রাষ্ট্রদেবতার চরণে আহূতি দিলাম। মুহূর্তে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যাব আমরা। মনে রাখতে হবে পৃথিবীটা যোগ্য মানুষের জন্য। অযোগ্যদের প্রতি প্রকৃতি বড়ই উদাসীন। যোগ্যতা এবং শক্তি যে কোন মূল্যে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই অলৌকিক অসম্ভব আলস্যের জগত থেকে আমাদের

উত্তরণ ঘটবে প্র্যাকটিক্যাল জগতে। আমরা আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী, উদ্যমী হয়ে উঠবো। বাস্তববাদী হয়ে উঠবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী। দেশকে সর্বস্ব মনে করলেই আমরা সত্যে, শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবো। কল্পনা, ভন্ডামী আর মিথ্যে নির্বাসিত হবে। অদৃষ্টবাদী অকর্মণ্য কুঁড়ে অপবাদ ঘুচে যাবে। অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। প্রতিটি আত্মসচেতন মানুষের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এটাই প্রত্যাশা। তাই উত্তরণেরও বেশী দেরী নেই। ইচ্ছা অনিচ্ছায় আমরা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

*****

প্রকাশকের কথা

উটপাখী ছুটতে পারে ঘন্টায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল। যা একটা তাজা ঘোড়ার ক্যাপাসিটি। লাথি মেরে সে একটি বলিষ্ঠ ঘোড়াকে শুইয়ে দিতে পারে, তার পায়ে এত জোর। এতো গতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী প্রাণীটি কিন্তু বিপদ দেখলেই বালিতে ঠোঁটটা গুঁজে দিয়ে চোখটা বন্ধ করে নেয়। হয়তো মনে মনে নামজপও করে, ভাবে বিপদ এড়ালাম। এই অবস্থায় তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘেয়ো কুকুর, রুগ্ন শেয়ালে। ঘৃণ্য মৃত্যু সে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তার আত্মবিশ্বাস শক্তি নিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি হয় না বলে। আমাদের এই ঐতিহ্যশালী দেশটায় জনসংখ্যা সম্পদ বীর পণ্ডিত সব ছিল, আজও আছে। তবু আমাদের কি করুণ পরিণতি! যার যখন ইচ্ছে হয়েছে দেশটা দখল করেছে ভোগ করেছে। স্বাধীনতার এতদিন পরও আমরা ভুগছি জাতীয়তার সঙ্কট ও সংহতির সঙ্কট নিয়ে। আধ্যাত্মিকতার বিপুল চর্চা সত্ত্বেও দেশে দুর্নীতি এবং ভেজালের বাড়বাড়ন্ত। অধিকাংশ বিদ্বান পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মানুষকেও মনে হয় ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য, ভণ্ড, বিশ্বাসের অযোগ্য। কেন এমন হ'ল! কোথাও নিশ্চয়ই আমাদের ভুল আছে, ফাঁকি আছে। সেই ফাঁকিটা কি ও কোথায় তারই অন্তর্ভেদী সত্যানুসন্ধান "দর্পণে মুখোমুখি।" আজকের ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে প্রায় নগ্ন করে দাঁড় করানো হয়েছে আয়নার সামনে। শুধু কষাঘাত নয়, নিশ্চিত নিরাময়ের ইঙ্গিতবাহী এই রচনা পাঠককে নতুন দিগন্ত দেখাবে, এ আমাদের গভীর বিশ্বাস। সেই প্রত্যয়েই তুলে দিচ্ছি পাঠকের হাতে এই নতুন সংস্করণ।

তপন কুমার ঘোষ